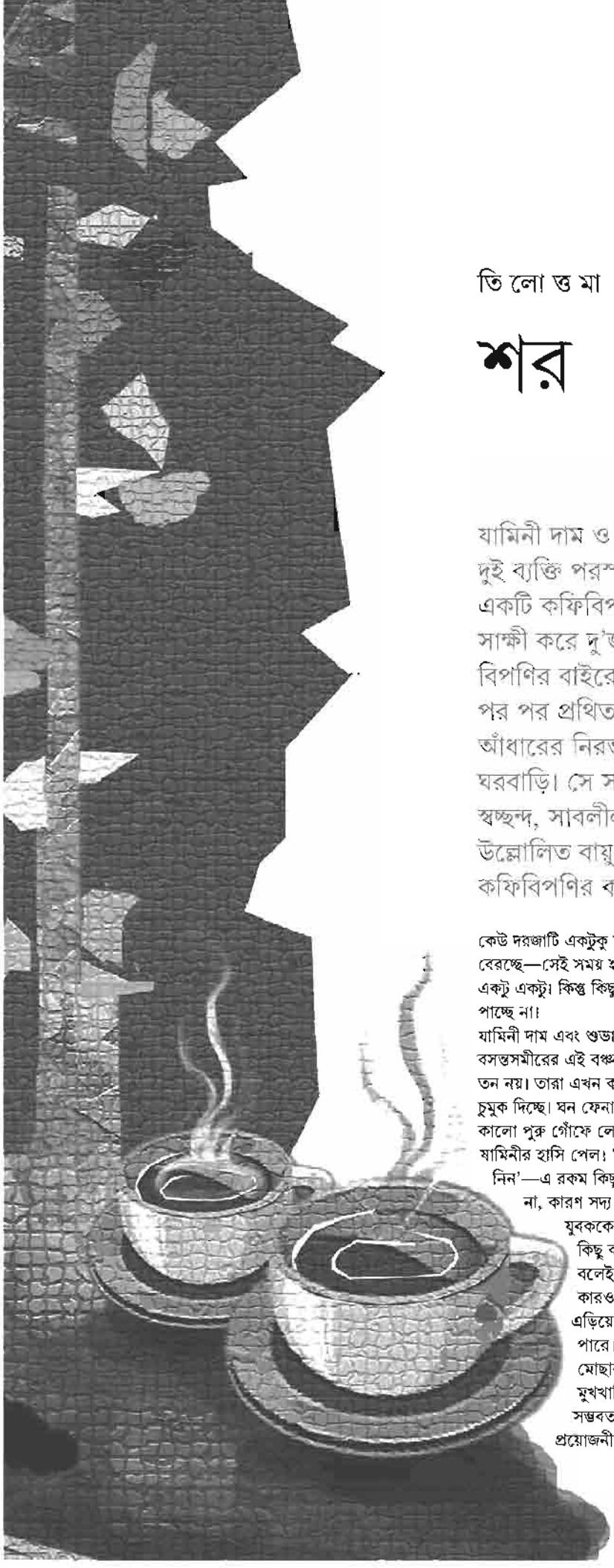

তিলোত্তমা মজুমদার

শর

যামিনী দাম ও শুভায়ন সরকার। চব্বিশ ঘণ্টা আগেও এই দুই ব্যক্তি পরস্পরের অস্তিত্ব সম্পর্কে অবহিত ছিল না। এখন একটি কফিবিপণির ছোট টেবিলে দু'কাপ ফেনিল ক্যাপুচিনো সাক্ষী করে দু'জনে মুখোমুখি বসেছে। কাচের দেওয়াল ঘেরা বিপণির বাইরে ব্যস্ত প্রশস্ত পথে দ্রুতগামী গাড়িগুলি। পর পর প্রথিত ঋজু আলোকস্তম্ভগুলির তলায় আলো-আঁধারের নিরন্তর ভালবাসা। তার ওপারে সুউচ্চ সুসজ্জিত ঘরবাড়ি। সে সবের বাতায়নে জ্বলে থাকা আলো এ শহরের স্বচ্ছন্দ, সাবলীল ও নিরাপদ জীবনের প্রতিবেদন। বসন্তের উল্লোলিত বায়ু এই সব বাড়িঘর আলোকস্তম্ভ ছুঁয়ে ছুঁয়ে কফিবিপণির কাচের দেওয়ালে ধাক্কা খেয়ে ফিরছে।

কেউ দরজাটি একটুকু ফাঁক করে ঢুকছে বা বেরোচ্ছে—সেই সময় হাওয়াও ঢুকে পড়ছে একটু একটু। কিন্তু কিছুতে সাড়ম্বরে প্রবেশ পাচ্ছে না।

যামিনী দাম এবং শুভায়ন সরকার বসন্তসমীরের এই বঞ্চনা সম্পর্কে সচেতন নয়। তারা এখন ক্যাপুচিনো কফিতে চুমুক দিচ্ছে। ঘন ফেনার কিছুটা শুভায়নের কালো পুরু গোঁফে লেগে রইল। দেখে যামিনীর হাসি পেল। 'আপনার গোঁফটা মুছে নিন'—এ রকম কিছু সে বলতে পারল না, কারণ সদ্য পরিচিত কোনও যুবককে গোঁফ সম্পর্কে কিছু বলা শিষ্টাচারবিরোধী বলেই তার মনে হল। অথচ কারও মুখোমুখি বসে গোঁফ এড়িয়ে সে কীভাবে তাকাতে পারে। সে অকারণে হাত মোছার কাগজ তুলে নিজের মুখখানিতে বুলিয়ে নিল। সম্ভবত গোঁফ মোছার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে কোনও ইঙ্গিত সে দিতে চাইছিল। শুভায়ন সরকার তা আন্দাজ করতে পারল। সেও কাগজ তুলে নিজের গোঁফ পরিষ্কার করে নিল। কাগজে হালকা বাদামি ছোপ দেখে সে হাসল। যেন কোনও দুষ্টুমি করে ফেলেছে, যা তার করা উচিত ছিল না, এমন লাজুক ও অপরাধী মুখে সে বলল, 'গোঁফে কফি লেগেছিল?' যামিনী হেসে মাথা নাড়ল। শুভায়ন বলল, 'ওদিকটায় সাড় কম। স্যান্ডুইচ খাবেন?' 'না-না। ভালই লাঞ্চ হয়েছে আমাদের। আপনার খিদে পেলে নিন না।' শুভায়ন মাথা নাড়ল। খিদে তারও পায়নি। দু'জন সদ্যপরিচিত অতিযুব বয়সী নারী-পুরুষ এর বাইরে আর কীভাবে কথোপকথনের সূত্রপাত ঘটাতে পারে। স্যান্ডুইচ খাওয়া হলে এর স্বাদ, অন্য কোথাকার স্যান্ডুইচ ভাল, কত রকমের স্যান্ডুইচ পাওয়া যায় ইত্যাদি বিষয়ে আড্ডা জমে উঠতে পারত। খাবার-দাবারের আলোচনায় দীর্ঘ সময় কাটিয়ে দেওয়া যায়। অতঃপর চলচ্চিত্র এবং গান আসতে পারে। দু'জনেই বাঙালি যখন,

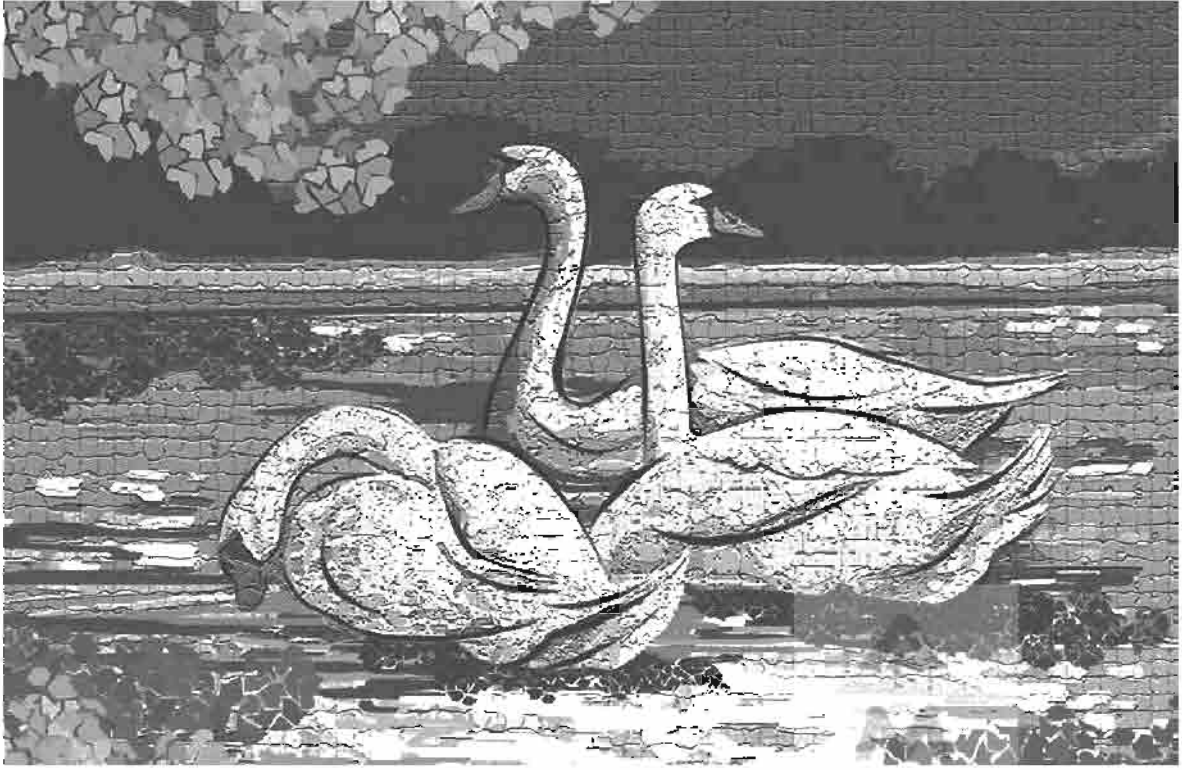

সত্যজিৎ রায়, মৃণাল সেন, উত্তমকুমার, সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়—প্রমুখ সম্পর্কিত আলোচনাও জমে উঠতে পারে। এই শহর ভুবনেশ্বর—রীতিমতো চর্চার বস্তু। এখানকার লিঙ্গরাজ মন্দির দেখেনি, এমন বঙ্গবাসী বিরল। আর সত্যিই এই মন্দির দর্শনীয়। শুভায়ন প্রায়ই এ শহরে আসে। শান্ত, পরিচ্ছন্ন শহরটি তার ভাল লাগে। এখানকার ছানাপোড়া, আতাফল, চিনেবাদামসেদ্ধ তার প্রিয়। চিংড়ির নানাবিধ ব্যঞ্জনের কী চমৎকার স্বাদ। শুভায়ন মিতাহারী কিন্তু ভোজনরসিক। তবে ভোজনরসিক মানুষের প্রকাশ নেই শুভায়ন সরকারের শরীরে। সে সুদেহী। সুশৃঙ্খল। নিদ্রা এবং জাগরণের সময়ের হেরফের সে করে না সাধারণত। পরিমিতি এবং নিয়মের মধ্যেই সে নিজেকে সংবদ্ধ রাখে। কাজের সূত্রে বহু লোকের সঙ্গে তার পরিচয়। সেই সব ব্যক্তিবর্গে নারী-পুরুষ পৃথকভাবে দেখার ইচ্ছা বা সংস্কার তার নেই। কাজের সম্পর্ক তার ব্যক্তিগত জীবনে কখনও প্রবেশ পায়নি।

আজ যামিনী দামের সঙ্গে এই সান্ধ্য বৈঠক—এর সঙ্গে তার পেশাগত যোগ নেই। একেবারে অচেনা একজন, যার সঙ্গে কী রকম কথা নিয়ে সময় যাপন করা যায়, সে জানে না। অতএব প্রাথমিকভাবে ভুবনেশ্বর বিষয়টিকেই সে বেছে নেয়। প্রশ্ন করে, 'ভুবনেশ্বরে আগে এসেছেন?' যামিনী বলে, 'এসেছি, বেশ কয়েকবার।'

'লিঙ্গরাজ মন্দির কী রকম লাগে?'

'অতি সুন্দর। বারবার দেখেও আশ মেটে না। আমি এখানকার ছোট-বড় সব মন্দিরে ঘুরেছি। ব্রহ্মেশ্বর, মুক্তেশ্বর, পরশুরামেশ্বর, রাজারানি, বৈতাল দেউল।'

'পুজো দিতে খুব ভালবাসেন?'

'পুজো? না-না। আমার পুজো-টুজো একেবারে আসে না। আমার দেখতে ভাল লাগে। লোকজন, পুণ্যার্থী, ভাস্কর্য। আপনি পুজো করেন?'

'আমিও করি না। আপনার মতোই। দেখতে ভালবাসি। তবে আমার স্ত্রী পুজো করে। আমাদের ফ্ল্যাটে ও একটা ঠাকুরঘর করেছে। অনেকটা হিন্দি সিনেমায় যেমন দেখা যায়।'

'আমার বাড়ি সিঁথিতে। সিঁথি জানেন তো?'

'জানি।'

'বেশ বড় বাড়ি। আমার শ্বশুরমশাইয়ের করা। বাগান আছে। ঠাকুরঘর। বাগানের দেখাশোনা আমিই করি। একজন ওড়িশি পুরোহিত আসেন নিত্য পূজার জন্য। বাগান করতে খুব ভাল লাগে আমার। যেখানে যত ভাল ভাল গাছ দেখি— মনে হয়, যদি বাগানের জন্য নিয়ে যেতে পারতাম। আসলে আমি তো কলকাতার নই। বড় হয়েছি চন্দননগরে। আমাদের বাড়িতে অনেক গাছ। গাছ ছাড়া থাকতে পারি না বলে বাবা বাগানওয়ালা বাড়িতে আমার বিয়ে দিয়েছিলেন। আপনাদের ফ্ল্যাট কোথায়?

'সল্ট লেকে। স্টেডিয়ামের কাছে। তেরো নম্বর ট্যাঙ্ক।'

সল্টলেকে সরকারের কর্তাব্যক্তিরা থাকায় বড় রকমের বিপর্যয় না হলে বিদ্যুৎ যায় না। পুলিশ খুব বিশ্বস্ততার সঙ্গে এখানে পল্লির পথে পথে টহল দিয়ে বেড়ায় এবং ঘনিষ্ঠ প্রেমিকযুগল দেখলে দেশের নৈতিক দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন পুলিশ তাদের প্রতি শাসনদণ্ড তুলে নেয়। সাধারণ পল্লিবাসী তার প্রতিবাদ করে না। ধরেই নেয় প্রেম বিনিময় কর্মটি, ধৃত দণ্ডিত যুগল ঝোপেঝাড়ে পথের নির্জনতায় শরীরে শরীরে ঘটিয়েছিল। কে না জানে, মানবজাতির পক্ষে প্রেম অবশ্যম্ভাবী কিন্তু দণ্ডনীয়। প্রেম সম্পর্কে মানবসভ্যতা জারি রেখেছে অসংখ্য নিষেধাজ্ঞা। এই সব নিষেধ এবং নিষেধ লঙ্ঘন করার রক্তাক্ত পাণ্ডুলিপির মধ্যে দিয়েই ভুবনের প্রেম কাহিনিগুলি অবিস্মরণীয় রূপ লাভ করেছে। প্রেমিক যুগলকে উত্যক্ত করার মধ্যে কর্তব্যরত পুলিশের বিকৃতানন্দ হয়ে ওঠার প্রবণতা আছে কি না, তা নিয়ে পল্লিবাসী কখনও ভাবিত হয়নি। শুভায়ন সরকার বুঝে নেয়, যামিনী দাম নিজের পছন্দ এবং অপছন্দ সম্পর্কে স্পষ্ট মতামত রাখে। অপরিচিতের কাছে নিজের কথা বলতেও তার সংকোচ নেই। হয়তো সংকোচভাবটিই যামিনীর মধ্যে কম। আবার যামিনীকে নিলাজও বলা যাবে না। এক সরল-সহজ ঋজুতা আছে তার মধ্যে। সহজ মেয়ে শুভায়ন কম দেখেনি। কিন্তু চলায়-বলায় সহজ মানেই সে সরল হবে, এমন কোনও কথা নেই। সে যামিনীর প্রতি খানিক আকর্ষণ বোধ করে। কেবল বাক্যালাপের আকর্ষণ। অতএব নিজের জীবনযাপন সম্পর্কে এক রকম ধারণা সে যামিনীকে দিতে চায়। তার আবাসনের নিকটবর্তী উদ্যানে প্রত্যহ ভোরের বেলা সে হাঁটতে যায়। সাধারণত অতি দ্রুত হেঁটে দশ পাক সম্পূর্ণ করে, যা কি না প্রায় চার কিলোমিটার দূরত্ব, কোনওদিন গুরুভোজন হয়ে গেলে, মনে মনে ক্যালরির অঙ্ক কষে সে দশ পাকের অতিরিক্ত দুই বা তিন পাক হেঁটে নেয়। কোনও দিন কোনও কারণে সকালের হাঁটা সারতে না পারলে সন্ধ্যায় সে এ কর্তব্য সমাধা করে। পল্লিটি অভিজাত হওয়ায় উদ্যানগুলি গাছে গাছে, ফুলে ফুলে ভরা। নিয়মিত জঙ্গল পরিষ্কৃত হয়। বাচ্চাদের দোলনাগুলি আস্ত এবং রঙিন। বসে বসে কথা কইবার কিংবা বিশ্রাম নেওয়ার সিমেন্ট বা লোহার আসনগুলি মহান বেদির মতো সহিষ্ণু এবং প্রতিবাদহীন। উদ্যানগুলি ভোরেরবেলা পাখির ডাকে, জনরবে, হাস্যচর্চায়, ভজনগানে এবং শরীর সচেতন ব্যক্তিবর্গের উপস্থিতিতে প্রাণবান।

মধ্যাহ্নে তার নির্জনতায় প্রেমিক-প্রেমিকা কতিপয় ঝোপঝাড়ের আড়ালে এসে বসে। বৈকালে বাচ্চা ও বাচ্চাদের মায়েরা চিকনকণ্ঠে উদ্যানের বাতাস ভরিয়ে তোলে। কিন্তু সন্ধ্যার পর নামে বিষণ্ণ নির্জনতা। বাতিস্তম্ভের আলোছায়া ভুতুড়ে মনে হয়। পথ দিয়ে দু-একটি সাপ এঁকেবেঁকে চলে যায়। তবু, শুভায়ন সরকার নির্ভয়ে হাঁটতে আসে। কোনওদিন দেখতে পায় প্রেমিকার ঠোঁট মুখে পুরে পান করছে প্রেমিক। সে পাশ দিয়ে হেঁটে যায়। কিছু বলে না। কেবল হেঁটে যায়। ঘাম ঝরায়। রক্ত চলাচলের গতি বৃদ্ধি করে। এতে সে ভাল থাকে। মেদহীন থাকে। সতেজ থাকে। এবং নীরোগ থাকে। রক্ত চলাচলের গতি বৃদ্ধি পেলে—সে জানে না কেন—তার যন্ত্রণা দূরে ঘাপটি মেরে বসে পড়ে। এই আরোগ্যের স্বাদ সে জিভে নেয়। আর ভাবে, ওই ঠোঁট ডোবানো চুম্বনের স্বাদ কেমন। মিতালী রায়, শুভায়নের বউ চুমু খেতে দেয় না। তার ঘেন্না লাগে। দুটি ভিন্ন মুখগহ্বরের লালা মিশে যাবে—এরকম সে ভাবতেও পারে না। তার স্তনাগ্রে মুখ দিলে, সে শুভায়নকে ঠেলে সরিয়ে দিয়েছে। তার গা ঘিন্ ঘিন্ করে। সঙ্গমের পর সে নিজেকে প্রায় আস্নানের মধ্যে নিয়ে যায়। এ কারণে—সঙ্গমকালীন এই বিভিন্ন নিষেধ শুভায়নকে উদ্বিগ্ন রাখে, এই বুঝি সে মিতালীর ঘৃণা জাগিয়ে তোলে। ভয়াবহ পরিস্থিতিতে প্রিয়তম মুহূর্ত যাপন। তবে দাম্পত্যে চুম্বন এমন কিছু অপরিহার্য নয়। মিতালী রায় এবং শুভায়ন সরকার যাবতীয় যৌনাচারের পর দুটি সন্তানলাভ করে তার প্রমাণ রেখেছে।

চুম্বন নিয়ে বেশি ভাববার অবকাশ হয়নি শুভায়ন সরকারের। যখন স্কুলের ছাত্র, স্বামী বিবেকানন্দের ছবি সামনে রেখে, পাড়ার ক্লাবের ব্যায়ামবীর গণেশদার শেখানো যোগাসন করে স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা পাঠ করত। কতক বুঝত, কতক নয়। এতদসত্ত্বেও যখন এক রাত্রে ঘুমের ঘোরে পরিহিত পাজামায় বীর্যস্খলন হয়, শুভায়ন সরকার পাক্কা সাতদিন আত্মধিক্কার দিয়েছিল। পিতৃদেবের আর্থিক ভার লাঘব করার উদ্দেশ্যে সে এক বাড়িতে গৃহশিক্ষকতা নেয়। ব্যায়াম-করা খেলাধুলা-করা সুগঠিত শরীর, দুধেআলতায় গোলানো উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত ত্বকবর্ণ, উজ্জ্বল নয় কিন্তু বৃহৎ দুই চক্ষু, ঠোঁটের গড়ন যেন কোনও বুদ্ধমূর্তির থেকে চুরি করে আনা—পাঁচ ফুট আট ইঞ্চি মেধাবী গৃহশিক্ষক তার ছাত্রীর পুস্তকসমূহ এবং বিবিধ বিষয়ের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ছাড়া আর কোনও দিকে নজর দেওয়ার অবকাশ পায়নি। কিন্তু ছাত্রীর নজর দিতে বাধা ছিল না। ছাত্রী ও গৃহশিক্ষকের চিরাচরিত প্রেমের গল্পের মতো, অঙ্ক বইয়ের উৎপাদক অধ্যায়ে সে এক টুকরো গোলাপি কাগজ গুঁজে রাখে, যাতে লেখা—আমি তোমাকে ভালবাসি। ইতি শ্রীপর্ণা।

শ্রীপর্ণা নামে মেয়েটি অঙ্কে কাঁচা ছিল। তবে এই বুদ্ধি তার ছিল যে গৃহশিক্ষক উৎপাদক অধ্যায় আরম্ভ করবেন, অতএব গোলাপি কাগজে শিহরিত ভালবাসা ওই অধ্যায় সংলগ্ন রাখতে হয়। এবং যথাকালে শুভায়ন সরকার তা পেয়েও যায়। এর জন্য সে প্রস্তুত ছিল না। অতএব তার সমস্ত মুখমণ্ডল দু'খানি কান সমেত রক্তিম বর্ণ ধারণ করে। হৃদযন্ত্রে ধুকপুকানি দ্রুত হয় এবং স্নায়ু বিবশ। সে শ্রীপর্ণার দিকে চাইতে পারে না। দু'আঙুলে, যেন প্রেমের চিঠি নয়, গোলাপি

অংশগ্রহণ করতে হলে? জিভে জল আনা একটি রেসিপি পাঠান আর ৮ থেকে ১৪ বছর বয়সী আপনার বাচ্চাকে বলুন লিখতে কি কারণে আপনি সুপার কুল মম। নাম ঠিকানা, ফোন নম্বর সহ আপনার ও আপনার বাচ্চার ছবি পাঠিয়ে দিন TTIS Super Cool Mom, ABP Pvt Ltd, 6, Prafulla Sarkar Street, Calcutta 700001 | অনলাইন এন্ট্রি পাঠাতে হলে ttis@abpmail.com

হেল্পলাইন **033 2456 6090** বিস্তারিত জানতে লগ অন করুন **www.ttis.in** এন্ট্রি জমা দেবার শেষ তারিখ **২১ শে এপ্রিল, ২০১১**

Radio partner

ছাত্রীর সঙ্গে প্রেম? অসম্ভব। কোনও অনৈতিক কাজ সে কীভাবে করে! অতএব সে বলেছিল, চোখ না তুলেই, 'আমাদের এখন অধ্যয়নের সময়। এ সব ভাল নয়।'

ইঁদুরছানা তুলছে, এমন ভঙ্গিতে কাগজখানি তুলে নতচক্ষে বলে—তোমার কোনও কাগজ। ঠিক জায়গায় রেখে দাও।

'ওটা আপনার, মাস্টারমশাই।' শ্রীপর্ণা ভাঙা গলায় বলেছিল। ওই ক'টি কথা লিখতে তার হৃদয় যত ব্যাকুল ছিল, যত সাহসী ছিল, ওই ক'টি কথা বলতে তার আকুলতা ছিল অপরিমেয়, শুভায়ন তা ভেবে দেখার চেষ্টাও করেনি। দেহচর্চার সঙ্গে একটু একটু কাব্যচর্চাও সে করে। অর্থাৎ তখনও করত, আজও করে। এবং কাব্যচর্চার সঙ্গে প্রেমের যে নিগূঢ় সম্পর্ক—তাও সে অস্বীকার করেনি, কিন্তু ছাত্রীর সঙ্গে প্রেম? অসম্ভব। কোনও অনৈতিক কাজ সে কীভাবে করে। অতএব সে বলেছিল, চোখ না তুলেই, 'আমাদের এখন অধ্যয়নের সময়। এ সব ভাল নয়।' গাম্ভীর্য এবং ছাত্রজীবনের নৈতিকতার গুরুত্ব প্রকাশের অভিপ্রায়ে ভেবেচিন্তে 'অধ্যয়ন' শব্দটি সে ব্যবহার করেছিল যেন ভরদ্বাজ মুনি শিষ্যদের উপদেশ দিচ্ছেন। কিন্তু অধ্যয়ন ও প্রেমের সে সংঘাতের ফলাফল হিসেবে প্রত্যাখ্যাত শ্রীপর্ণা কেঁদে ফেলল নিঃশব্দে। তার অশ্রুবিন্দু খোলা অঙ্ক খাতার সাদা পাতায় টুপটাপ পড়তে লাগল আর পিছনের পাতায় কষা অঙ্কের বিপরীত ছাপ জলে ভিজে ফুটে উঠল।

প্রাথমিক আঘাত সমলে শুভায়ন এতক্ষণে নিজস্ব ব্যক্তিত্বে অধিষ্ঠিত। এবার সে ধমকের স্বরে বলে, 'চুপ করো। বোকার মতো কেঁদো না। এ রকম করলে আর পড়ানো সম্ভব নয়।' এতে শ্রীপর্ণা নামের অভিযুক্ত কিশোরীর কান্না আরও বেড়েছিল, যাতে শুভায়ন চেয়ার ঠেলে উঠে পড়ে এবং শ্রীপর্ণাকে একাকী রেখে পথে নেমে আসে। মাথার ওপরকার খর রোদ্দুরে সে উপলব্ধি করে সার সত্য—শ্রীপর্ণাকে পড়ানো সত্যি সম্ভব নয়।

যার মাধ্যমে শুভায়ন এই গৃহশিক্ষকতা লাভ করেছিল, সে তার প্রিয় বন্ধু শ্রীরূপ। অদ্যাবধি শ্রীরূপ শুভায়নের প্রিয় বন্ধুই রয়ে গেছে, কিন্তু সে এখন ভিন্‌দেশে জনগণের মনের ডাক্তারি করে বেড়ায়। দেশকে সে ভোলেনি, কলকাতা শহরকে ভোলেনি, বন্ধুকেও। আন্তর্জাল মাধ্যমে দেশের খবরাখবর সে রাখে। আপন বিষাদে আক্রান্ত হলে সে শুভায়নের সঙ্গে দীর্ঘসময় মুঠোয় পুরে নিরন্তর কথা বলে এবং প্রত্যেকবার প্রস্তাব রাখে, 'শালা, চল্, সব ছেড়েছুড়ে রুদ্রপ্রয়াগে একটা ছোট্ট ঘর বানিয়ে থাকি।' বাস্তবিক, সে রুদ্রপ্রয়াগে থাকতে যাবে না। তার ভিন্‌দেশের বিলাস-বৈভবপূর্ণ প্রতিষ্ঠিত নিরাপদ জীবন, তার মধুরিমাময়ী স্ত্রী সুমনা এবং মায়াবী তিন সন্তানের নিশ্চিত সাফল্যমণ্ডিত ভবিষ্যৎ ছেড়ে সে যত দুঃখে রুদ্রপ্রয়াগবাসী হতে পারে, তার দশমিক শূন্য দুই ভাগ দুঃখও তার নেই। তবে কি না, বৈভব, বিলাস নিরবচ্ছিন্ন সুখ এবং পেশাগত প্রতিষ্ঠার একরকম ক্লান্তি আছে, যা এককালের দারিদ্র্যসংগ্রামী শ্রীরূপকে আচ্ছন্ন করে এবং তার রুদ্রপ্রয়াগ প্রতিষেধক কল্পনা প্রয়োজন হয়। সেই সময়, সেই গৃহশিক্ষকতার কালে দুই বন্ধু 'জয় ভোলানাথ' বলে অল্প টাকা নিয়ে পাড়ি দিয়েছিল কেদার-বদ্রী-হেমকুণ্ড। তারই শীতল মহান সুন্দর ও নির্মল মূর্তি মনে রুদ্রপ্রয়াগরূপে রয়ে গেছে। শুভায়নের পক্ষ থেকেও আজ পর্যন্ত কেদার-বদ্রী-হেমকুণ্ডই দীর্ঘতম পদযাত্রা। ওই স্মরণীয় ভ্রমণের পর দুই বন্ধুই নিজস্ব ভবিষ্যৎ মাথায় রেখে এতখানি পঠনপাঠন অভিমুখী হয়ে পড়ে যে তেমন আশ্চর্য ভ্রমণ আর ঘটে ওঠেনি। যে-যার পেশায় ব্যাপৃত হওয়ার পরেও নয়। কারণ পেশাজীবীদের পেশাদার হয়ে উঠতে গেলে, সুনাম-দক্ষতা এবং নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠা করতে গেলে দীর্ঘকাল মুখে ফেনা তুলে অশ্ববৎ ছুটতে হয়।

রুদ্রপ্রয়াগের প্রস্তাবের মতো, সেই ছাত্রাবস্থায় তারা গৃহশিক্ষকতার ভুবন ভাগাভাগি করে নিয়েছিল। শ্রীপর্ণাকে পড়াবার প্রস্তাব প্রাথমিকভাবে শ্রীরূপের কাছেই আসে এবং সে-ই শুভায়নকে পাঠায়। শুভায়ন শ্রীরূপকে গোলাপি প্রেমচিঠির বৃত্তান্ত সবিস্তারে বর্ণনা করলে, শ্রীরূপ উত্তাল হা-হা হাসির ভিতর বলে, 'এরকম নায়কোচিত চেহারা নিয়ে কচি কচি মেয়েদের পড়াতে গেলে প্রেমচিঠিই উৎপাদিত হবে! আমাকে দ্যাখ, রোগা-ঢ্যাঙা-কালো! একেবারে সাক্ষাৎ শ্রীরূপ। রবীন্দ্রনাথ জীবিত থাকলে আমায় ব্যঙ্গ করে ডাকতেন বিশ্রীরূপ বলে। তিনিও নেই, মেয়েদের তরফ থেকেও কোনও উৎপাত নেই। তা শ্রীপর্ণাকে দেখতে কেমন? পছন্দ?'

এই প্রশ্নে শুভায়ন যথেষ্ট বিপন্ন বোধ করেছিল। শ্রীপর্ণাকে দেখতে কেমন? শ্রীপর্ণা ইংরেজিতে কাঁচা কী পাকা, অঙ্কে সবল কী দুর্বল, জীববিজ্ঞানে আগ্রহী কী অনাগ্রহী ইত্যাদি সকল প্রশ্নের জবাবই সে দিতে পারত। কিন্তু সে দেখতে কেমন এই উত্তর তার জানা ছিল না। সে বলে, 'ও সব ছাড়। আরেকটা জোগাড় করে দে। এখানে আর পড়াব না।'

শ্রীরূপ হাসি চেপে বলে, 'আছে আরেকটা। সে-ও মেয়ে।'

'বেশ।'

শুভায়ন সরকার দাড়ি কাটল না। চুল ছাঁটল খোঁচা খোঁচা করে। ঢোলা পাজামা পরল আধময়লা। শার্ট তার এমনিতেই তিনটির বেশি ছিল না। তারই মধ্যে যেটির কাঁধের কাছে টুটে গিয়েছিল এবং সে পাড়ার দর্জিদ্বারা তাপ্পি মারিয়ে কাজ চালাচ্ছিল, সেটিই গৃহশিক্ষকতার পোশাক হিসেবে নির্বাচন করল, সঙ্গে একটি বৃহৎ ছাতা এবং পায়ে সেলাই করা চটি। একটি চশমা পেয়ে গেলে তার শিক্ষকবেশ সম্পূর্ণ হত, কিন্তু চশমার অভাব মেনেই তাকে পড়াতে যেতে হল। তাতে অবশ্য প্রত্যাশিত ফলই মিলল। ছাত্রী সুপর্ণা এবং তস্য ভগিনী ত্রিপর্ণা তার নাম দিল ঝগড়ু। এবং নানা ছলে তাকে শুনিয়ে ছাড়ল।

ঝগড়ু নাম নিয়ে শুভায়নের কোনও আপত্তি ছিল না, কারণ তাদের পাড়ার পিছনবাগে যে জেলেপাড়া বা মেছুয়াপট্টি ছিল সেখানে ঝগড়ু নামখানি সহজলভ্য ছিল। তবে কোন মনস্তত্ত্ব এই নামকরণের প্রেরণা হিসেবে সক্রিয় তার সন্ধান সে করতে পারেনি। সেই থেকে তার ধারণা হয়, মেয়েরা বড় দুর্বোধ্য, এমনকী স্ত্রী মিতালী বা মা শোভাদেবী সম্পর্কেও সে একই সিদ্ধান্তে অটল। তার সিদ্ধান্তের সমর্থনে বহু বাণী ও বচন প্রচলিত। অতএব নিজস্ব সিদ্ধান্ত সম্পর্কে শুভায়ন সরকার সন্দিহান নয়।

আজ শ্রীরূপ ভিন্‌দেশে প্রতিষ্ঠিত চিকিৎসক। শুভায়ন স্বদেশে আপন শহর কলকাতায় এক স্বনামধন্য বহুজাতিক সংস্থার বিপণন বিভাগীয় পরিচালক। পূর্বেকার মেছুয়াপট্টির পৃষ্ঠলগ্ন পাড়া ছেড়ে, সে কবেই সল্টলেক নিবাসী। এক বিস্তীর্ণ সুনির্দিষ্ট অঞ্চল তার কর্মক্ষেত্রের অধীন। এ শহরে ও শহরে তাকে যেতে হয় প্রায়ই। আজকের সন্ধ্যায় সে বসে রয়েছে ভুবনেশ্বরের এই কফিবিপণিতে যামিনী দামের মুখোমুখি। গত সন্ধ্যায় কলকাতা থেকে ভুবনেশ্বর আসার বিমানে সে ছিল জানালার পাশের আসনে। এই নারী তার পাশে। সাধারণত শুভায়ন কর্মসংক্রান্ত ভ্রমণে বিশেষ অভিজাত শ্রেণিতে যাতায়াত করে। কিন্তু স্বল্প পাল্লার অনেক বিমানেই ইদানীং বিশেষ শ্রেণির সুবিধা নেই। এই বিমানেও ছিল না। বিশেষ শ্রেণি, বিশেষ সুবিধা, বিশেষ বাসভবন—প্রভৃতি বিষয়ে শুভায়ন সরকার খুব খুঁতখুঁতে নয়। যা পায়, যেমন পায়, তাকেই গ্রহণ করে। তার যৌথ এবং যৌনজীবনেও এ কথা সত্য। কামবোধ নিয়ন্ত্রণে রাখতে হয়, এই শিক্ষা সে অভ্যাস করেছিল বটে, তবে বিবাহের

পর সমাজস্বীকৃত উপায়ে যৌনাচার আরম্ভ করে সে যখন, টের পায়, এর স্বাদ তার প্রাণ-মন অধিকার করে নিল। তার এ আকাঙ্ক্ষা তীব্র। কামনার পরিসর বিপুল। এর অপার্থিব স্বাদের সঙ্গে তার কবিমনের কল্পনা মিশে স্ত্রীকে নিয়ে গড়া একান্ত নিভৃত জগৎটুকুকে সে সাজিয়ে তুলতে চাইল, যেন তাদের শয়নকক্ষে আসন পেতেছেন রতিদেবী আর কামদেব। কিন্তু শীঘ্র সে টের পেল কামদেবের আশীর্বাদ সে যতখানি পেয়েছে, রতিদেবী ততখানি করুণা করেননি। যৌনাচার, মিতালীর কাছে কেবল নিয়মসিদ্ধ প্রক্রিয়া, যা নর ও নারীকে পালন করতে হয়। শুভায়নের কল্পনা এবং আকাঙ্ক্ষা আঘাত পেল ঠিকই, কিন্তু সে মেনে নিল। অন্য কোথাও আকাঙ্ক্ষার নিষ্কৃতি খুঁজতে গেল না। তবে টের পেল, তার অতৃপ্তি কেবল শরীরী রইল না। মনেরও হয়ে উঠল। আপাতত কবিতার সঙ্গেই তার কাঙ্ক্ষিত রতিক্রীড়া। হতে পারে এর ফলেই তার অদ্ভুত স্নায়ুরোগ!

কাল বিমানের উড়ান জারি হওয়ার পরেই অকস্মাৎ সেই অদ্ভুত স্নায়ুরোগের অসহ্য যন্ত্রণা শুভায়নের মাথা থেকে কানের পাশ দিয়ে বামদিকের চোয়াল বেয়ে ঠোঁট পর্যন্ত নেমে আসতে লাগল। যেন কোনও দুষ্টু ছেলে শুভায়নের মাথার কোনও শিরা ধমনী বা স্নায়ুতন্তুর ওপর বিন্দু বিন্দু ফেলতে থাকছে যন্ত্রণার জ্বালা। যন্ত্রণার তীব্রতায় শুভায়নের মধ্যে অস্থিরতা দেখা গেল, দু'হাতের মুঠি শক্ত, মুখমণ্ডল বিবর্ণ স্বেদাপ্লুত। চোখ থেকে, তার অনিচ্ছা সত্ত্বেও ঝরে পড়ছে অশ্রুবিন্দু। সে প্রাণপণ শক্তিতে ব্যথা ঠেলে পাঠানোর চেষ্টা করছে। যামিনী দাম, সম্ভবত জানালা মাধ্যমে বাইরেকার আকাশ দেখতে প্রয়াসী ছিল। এরই মধ্যে সে শুভায়নের ভাবান্তর লক্ষ করে এবং অতি সহজে তার হাতে আলতো হাত রেখে প্রশ্ন করে, 'আপনি কি অসুস্থ বোধ করছেন? কারওকে ডাকব?'

'দয়া করে ডাকবেন না কারওকে। আমি সামলে নেব।'

'কী হচ্ছে?'

'অসহ্য যন্ত্রণা।'

'কোথায়?'

'মাথায়।'

'মাইগ্রেন আছে আপনার?'

'না, পরে বলছি।'

'জল খাবেন?'

'খাব।'

এরপর যামিনী দাম শুভায়ন সরকারের শুশ্রূষা করে। বিমানসেবকের পরিবেশিত জলের ছোট্ট বোতলের মুখটি খুলে তাকে জল পান করায়। এবং আর কিছুই নয়, শুভায়নের বাম হাতখানি নিজের দক্ষিণ হাতে নিয়ে, মৃদু স্পর্শে তার বাহু থেকে করতল পর্যন্ত নিজের বাম হাত বুলিয়ে চলে। কোনও অপরিচয়ের বাধা নেই, বিনালাপের লজ্জা নেই, নারীদেহ-পুরুষদেহ সম্পর্কিত সংস্কারের পরোয়া নেই, কেবল এক পীড়িতের জন্য সহমর্মীর কোমল স্পর্শ—এমন যে সম্ভব, এমন যে স্বাদ আছে এই ভুবনে, শুভায়ন ইতিপূর্বে জানেনি। ছোটবেলায় জ্বরতপ্ত কপালে মা শোভাদেবীর স্পর্শ—এ তেমন নয়, বিবাহিত জীবনের প্রেমাকুল স্পর্শ মিতালীর, এ সে রকমও নয়। অন্য কিছু। অন্য রকম। যেন অতি মৃদু স্বরে গাওয়া মারোয়া-শ্রীরাগের ধ্বনি। শুভায়নের পেশিগুলি, স্নায়ুগুলি ক্রমে শিথিল হয়ে আসে। যন্ত্রণার প্রবাহ থেকে সচেতনতা নিদ্রার দিকে ঢলে পড়ে। ব্যথার পীড়নের সঙ্গে কোমল একাগ্র স্পর্শের যুদ্ধ এক নিবিড় অনুভূতির দিকে শুভায়নকে নিয়ে যায়। যে ছিল কবি, বিপণনের জটিল সাম্রাজ্যে আত্মপ্রতিষ্ঠার দৌড়ে সে সামিল। কিন্তু ভোলেনি কবিতাকে, তার মনে হয়, এ-ও এক সার্থক কবিতা, এই সহমর্মিতার পরশ।

বিমান অবতরণের কাল পর্যন্ত যামিনীর স্পর্শ জারি ছিল। নিদ্রাবেশ টুটলে শুভায়ন ম্লান হেসে বলে, 'অনেক ধন্যবাদ আপনাকে।'

'এখন কেমন বোধ করছেন?' প্রশ্ন করে যামিনী।

'অনেক ভাল। আপনি কি রেইকিতে বিশ্বাস করেন?'

'না। এ আমার ঠাকুরমায়ের শিক্ষা। রেইকি হয়তো এরকমই কিছু। আমার পরিচয় দেওয়া হয়নি আপনাকে। এই আমার পরিচিতিপত্র।' তারা পরস্পর দ্রুত হাতে নিজস্ব পরিচিতি বিনিময় করে তখন। একটু পরেই যে যার মতো চলে যাবে। ভুবনেশ্বর বিমানবন্দর খুব বড় এবং ব্যস্ত নয়। তাড়াতাড়িই তোরঙ্গ প্রাপ্তির ঝঞ্ঝাট মিটে যায়। শুভায়ন যামিনীর পরিচিতিপত্রে চোখ বুলিয়ে বলে, 'ক'দিন আছেন এখানে?' যামিনী বলে, 'কাল-পরশু আমাদের অধিবেশন আছে। সেরে তরশু সকালের বিমানে ফিরে যাব।'

'আমি আছি কালকের দিনটা। অধিবেশন কতক্ষণ? সন্ধ্যায় কফিপানের আমন্ত্রণ জানাতে পারি কি আপনাকে?'

'নিশ্চয়ই। আমার কাজ চারটে পর্যন্ত। ছ'টা নাগাদ আসতেই পারি।'

'উঠছেন কোথায়? মানে বলতে যদি কোনও আপত্তি না থাকে।'

'আপত্তি কীসের? মন্দির মার্গে। বিমানবন্দর থেকে বেরিয়ে, খানিকটা পূর্বদিকে গেলেই গৌতম নগরে জায়গাটা—ওখানে আমাদের একটা আস্তানা আছে। আপনি?'

'আমি? 'গোল্ডেন আই'-এ। ওখানে একটা সুন্দর কফিশপ আছে। আমি ছ'টায় অপেক্ষা করব। আপনার সঙ্গে গাড়ি থাকবে তো? গৌতম নগর থেকে জায়গাটা বেশ দূরে। শহরের বাইরের দিকে।'
'গাড়ি একটা থাকবে...তবে...জায়গাটা আমি মোটামুটি জানি। কলিঙ্গ হাসপাতালে গিয়েছি। ওদিক দিয়েই তো। তা ছাড়া ন্যালকো নগরেও আমার চেনা আছে। আমি চলে আসব।'
যামিনীর গাড়িখানি শুধুমাত্র অধিবেশনের কাজে ব্যবহারের জন্য। বিকেল পাঁচটার পরে তার আর গাড়িতে অধিকার থাকে না। হোটেল 'গোল্ডেন আই' পাঁচতারা। শহরের বাইরের দিকে, শহর যেখানে বিবর্ধিত এবং সুপরিকল্পিত, সেখানে অনেকখানি জায়গা জুড়ে বড় মনোরম তার অস্তিত্ব। যামিনী আগে এই পথে এসেছে ঠিকই, কিন্তু এই হোটেলে আসেনি। আজ মন্দির মার্গে তার অতিথিশালা থেকে একটি অটোরিকশ ভাড়া করে সে এসেছে। এবং ভিতরে প্রবেশ করে মুগ্ধ হয়ে গেছে। পাঁচতারা হোটেল অতি সুসজ্জিত হবে—এ আর নতুন কী। যামিনীকে মুগ্ধ করল ভিতরকার বিরাট জলাশয়খানি, যার মধ্যে উচ্ছ্বসিত ফোয়ারাগুলিতে রামধনুর সাত রং খেলে বেড়াচ্ছে। এই সায়ংকালে আলোর ছটা প্রগাঢ় নয়। আকুল-করা বসন্ত বাতাস অসম্ভব স্বেচ্ছাচারী। জলাশয়ের পারে সুসজ্জিত বৈঠকী আয়োজন। তার ইচ্ছে করছিল, এমনই খোলা আকাশের তলে, এমনই মধুমাধবী সমীরণ গায়ে মেখে ওই পুকুরপাড়ে বসে। কিন্তু তার আমন্ত্রণ কফি বিপণিতে।
কফিতে চুমুক দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে যামিনীর চোখ কেবলই শুভায়নের মুখ ছাপিয়ে চলে যাচ্ছে বাইরের দিকে। শুভায়ন তা লক্ষ করছে। এখনও পর্যন্ত গত সন্ধ্যার অসুস্থতার কথা ওঠেনি। শুভায়ন প্রশ্ন করল, 'বাইরে বসবেন?' যামিনীর মুখ হাসিতে ভরে গেল। বলল, 'বসা যায়?'
'কেন যাবে না? চলুন।'
'কফি শেষ হয়নি যে।'
'দিয়ে আসবে। বলে দিচ্ছি।'
এবারে জলাশয়ের পারে তারা মুখোমুখি। শুভায়ন বলল, 'আমি মদ্যপান করি না। আপনি যদি পছন্দ করেন তো বলতে পারি।'
'আমিও করি না। এখানে লেবু-চা পাওয়া যায় না? কী সুন্দর বাতাস! আরে! দেখুন দেখুন, ওই ঝোপের তলায় হাঁস!'
'হ্যাঁ। দিনের বেলায় ওরা ঝাঁকে ঝাঁকে ঘুরে বেড়ায়। সবাই বিস্কিট খেতে দেয়। খুব সুন্দর লাগে। লেবু-চা বলব?'
'একটু পরে। বাইরে এসে খুব ভাল লাগছে। আপনাকে ধন্যবাদ।'
'কিসের জন্য?'
'আমাকে এখানে আমন্ত্রণের জন্য। মন্দির মার্গ খুব ঘিঞ্জি। খুব গোলমাল।'
'ধন্যবাদ তো আমার দেওয়ার কথা আপনাকে। কাল কী আশ্চর্যভাবে সারিয়ে তুললেন!'
'এখন আর ব্যথা নেই তো?'
'আছে। অত তীব্র নয়।
যামিনী খানিক অন্যমনস্ক, খানিক উদাস। সাধারণ একটি বিনুনি করা চুল। চূর্ণ কুন্তল হওয়ায় উড়ছে। মুখে প্রসাধন কিছু নেই। কালো তার রং। কিন্তু ত্বকের মসৃণতায় আলো ঠিকরোচ্ছে। হাসলে গালে টোল পড়ে। চোখ দুটি ছোট কিন্তু ঘন পল্লবময়। তীক্ষ্ণনাসা সে। চিবুকে ছোট্ট খাঁজ। কানে দুটি সোনার ফুল। এক হাতে লোহার ওপর সোনা বাঁধানো বালা। অন্য হাত শূন্য। রোগাটে শরীরে সাধারণ সুতির কুর্তি এবং জিনস। মাঝারি উচ্চতা তার। টেনেটুনে পাঁচ ফুট দু'ইঞ্চি। অকারণে সে দু'হাত ঘষে বলল, 'কী অসুখ আপনার?'
'কী বলি বলুন তো? মাথায় খুব যন্ত্রণা হয়। অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষা হয়েছে, ধরা যায়নি কিছু। আমার বন্ধু শ্রীরূপ খুব ভাল ডাক্তার। মনের চিকিৎসা করে। সে অবশ্য বলেছে, এটা মনের অসুখ নয়।'

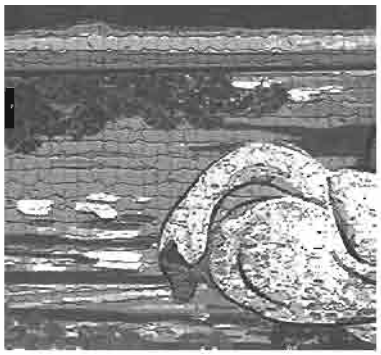

'মনের অসুখ—সেটা কে বলল?'
শুভায়ন হেসে বলে, 'অনেক ডাক্তারই বলেছেন। পরীক্ষায় কিছু ধরা পড়েনি যে। আমার স্ত্রীরও এমনই বিশ্বাস। আমিও মাঝে মাঝে ভাবি—গোটা ব্যাপারটাই আমার কল্পনা নয় তো?'
'ভুতুড়ে ব্যথা? আশ্চর্য! আপনার বন্ধু কী বলেন?'
'ও বলে মস্তিষ্কে অনেক সময় সূক্ষ্ম পিণ্ড তৈরি হয়, যা প্রাথমিক অবস্থায় ধরা পড়ে না। রক্তচলাচলে বাধা দেয় বলে যন্ত্রণা হয়।'
'ধরা পড়ানোর জন্য তার লালন-পালন প্রয়োজন বলছেন?'
'সেরকমই দাঁড়িয়েছে।'
'বাব্বাঃ! পৃথিবীতে কত রকম রোগ!'
'তা তো ঠিকই। ভাল ছিলাম। অনেকদিন পর আবার ব্যথাটা ফিরেছে। ওষুধ খেতে হবে আবার। ইচ্ছে করে না। এই ওষুধের অনেক খারাপ ফলাফল আছে। তবে আপনি কিন্তু কাল প্রায় অলীক শুশ্রূষা করেছেন।'
'অলীক শুশ্রূষা? বাঃ! এরকমভাবে কবিরা বলে। আপনি কি কবি?'
'কবি?' শুভায়ন শুকনো হাসে। লাজুক স্বরে বলে, 'লেখার চেষ্টা করি।'
'বাঃ! বই আছে?'
'বই? না-না। ছাপতে দিই না এখন। কলেজে পড়তে দিয়েছি।'
'লেখেন, কিন্তু ছাপেন না? কেন?'
'কী লাভ? ইচ্ছে করে না।'
'শোনাবেন আপনার কবিতা?'
শুভায়ন মোট চারটি কবিতা যামিনীকে শোনায়। যামিনী এক হাতে গাল রেখে, এক মনে শোনে। শুভায়নের বাচনভঙ্গি চমৎকার। পর পর চারটি কবিতা শুনে যামিনী বলে, 'ভাল বুঝলাম না। হয়তো আপনাকে আর একটু জানা থাকলে বুঝতাম। অবশ্য কবিতা আমার আজকাল পড়াও হয় না। এ সব হল চর্চার বিষয়। চর্চা না করলেই মন পিছিয়ে পড়ে। আমি যখন অনেক দিনের পরে এস্রাজ নিয়ে বসি, প্রথমদিকে আঙুলগুলো চলতে চায় না। মাথার মধ্যে সুরগুলো ধরা দিয়েও পিছলে পিছলে যায়। তখন কষ্ট হয়।'
'এস্রাজ বাজান? বাঃ!'
'আমার ঠাকুরমায়ের উপহার। আমার পাঁচ বছরের জন্মদিনে তাঁর এস্রাজটি আমাকে দিলেন। ভাল করে ধরতেই পারতাম না।'
'তিনিই শেখাতেন?'
'অনেকদিন। তার পর আমার মাইগ্রেন হল।'
'মাইগ্রেন? সে তো খুব কষ্ট।'
'হ্যাঁ। কিন্তু ভেবে দেখুন কী সৌভাগ্য আমার। ব্যথাটা আপনার ব্যথার মতো ভুতুড়ে নয়।'
শুভায়ন হেসে বলে, 'ব্যথার সঙ্গে ব্যথার দেখা। সমুদ্দুরে। নোনা জলের ঢেউ এসে ওই ভাসিয়ে দিল অনেক দূরে। কোথায় সে দূর? নেই সীমানা। ব্যথার কথা অন্য ব্যথার হয়নি জানা।'
'তার পর?'
'তার পর আর কী? এরকম মুখে মুখে বানাতে বেশ লাগে। এবার আপনার ঠাকুরমা আর এস্রাজের কথা শুনব।'
'বেশ। হল কী, মায়ের সঙ্গে ঠাকুরমায়ের বনত না। যেমন হয় শাশুড়ি-বউয়ের। মা সকলকে বলতে লাগলেন, এস্রাজ বাজিয়েই আমার মাইগ্রেন হয়েছে। ঠাকুরমা খুব কষ্ট পেতেন শুনে। রাতে ওঁর কাছেই ঘুমোতাম। ব্যথায় যখন ছটফট করতাম, ঠাকুরমা রাত জেগে জেগে ওই ওমনি করে আমার হাতে-পিঠে-কপালে হাত বুলিয়ে দিতেন। খুব আরাম হত। যন্ত্রণা এবং আরামের অপূর্ব যুগলবন্দি। সেই সময় ঠামি, মানে আমার ঠাকুরমা বলতেন, যেমনই যন্ত্রে সুর সাধিস, তেমনই যন্ত্রে ব্যথার সময় গায়ে হাত বুলিয়ে দিতে পারলে উপশম হয়। হয় জানেন—কিছু একটা হয়। স্পর্শের এক অসামান্য শক্তি আছে।'
'আছে। আমিও বিশ্বাস করলাম। কিন্তু এটাও বোধহয় সত্যি যে যিনি স্পর্শ করছেন, তার

মানসিক শক্তি ওই স্পর্শে সঞ্চারিত হওয়া চাই।'

'চাই-ই তো। ধরুন, যে লোক বনের পাখি দেখে আনন্দ পায় তার দেখা, আর যে লোক পাখি ধরে বেচবে বলে বনে ফাঁদ পাতে তার দেখা কি এক হয়? মানুষ আনন্দ থেকে যা করে, কোনও কিছুর সঙ্গেই তার তুলনা নেই।'

কিছুক্ষণ দু'জনেই নীরব হয়ে রইল। হঠাৎ বসন্তে ঢুকে পড়ল বর্ষণ। আকাশে বিদ্যুৎ ঝলসে উঠল। হাওয়া উঠল উত্তাল। শুকনো পাতা আর বালুকণা চোখে-মুখে এসে লাগল। বড় বড় ফোঁটায় বৃষ্টি নামল হঠাৎ। যে যেখানে ছিল, দুদ্দাড়িয়ে ছুট লাগাল ঢাকা জায়গায়। যামিনী বলল, 'ভিজবেন?' শুভায়ন তার হাত টেনে বলল, 'অন্য দিন! এখন চলুন।' তারা ভিজতে ভিজতে ছুটতে ছুটতে ঢাকা বারান্দায় এসে পড়ল। ছোটাছুটি করে বালিকার মতো উচ্ছ্বসিত হল যামিনী। এক-বুক শ্বাস নিয়ে সে বলল, 'আঃ! ভিজে মাটির কী সুন্দর গন্ধ! আপনার ভাল লাগছে না? এই জায়গাটা সত্যি খুব ভাল। হোটেল বলে মনেই হচ্ছে না।'

শুভায়ন যামিনীর হাত ছেড়ে দিয়েছে। তার বৃষ্টি দেখার চাঞ্চল্য অতি সুমধুর। শুভায়নের মনের মধ্যে কবিতা ঘনিয়ে উঠল। কিন্তু পূর্ণরূপে ধরা দিল না। তার মনে পড়ল, বিবাহের পর পর মা, বাবা ও মিতালীকে নিয়ে আরাকু উপত্যকা গিয়েছিল। সেপ্টেম্বর মাস। অপূর্ব সুন্দর ছিল প্রকৃতি। সেদিন সকাল থেকে মেঘলা। তারা আরাকুর ঢালু পথ বেয়ে গাছগাছালির ফাঁকে ফাঁকে হাঁটছিল। অকস্মাৎ বৃষ্টি এল তোড়ে। শীতল বারিপাতে মিতালী কাঁপতে লাগল। শুভায়ন নিজের সমস্ত উষ্ণতা দিয়ে মিতালীকে জড়িয়ে ধরেছিল। মিতালী খুব কাতরভাবে বলেছিল, 'আমরা শুধু দু'জন কোথাও যেতে পারি না?' শুভায়নের খুব কষ্ট হয়েছিল মিতালীর জন্য। এইভাবে বাহুলগ্ন করে সে মিতালীকে তাদের আবাস পর্যন্ত নিয়ে যেতে পারত। কিন্তু খানিক পথ যাবার পরেই তারা পৃথক হয়ে যায়। কারণ বাবা-মা ছিলেন

শুভায়ন বলল, 'আপনার আপত্তি না থাকলে আমরা ঘরে গিয়েও বসতে পারি। বারান্দায় বসে বৃষ্টি দেখা যাবে।'

'বেশ তো। চলুন।'

সেখানে। শুভায়ন ও মিতালী যেখানে যতবার বেড়াতে যাবার আয়োজন করেছে, শোভাদেবী সঙ্গে যাবার বায়না ধরেছেন। গৃহে সবার মধ্যে পরস্পরকে পাওয়ার সঙ্গে, প্রকৃতির উদার দানের আশিস নিয়ে নারী-পুরুষের একান্তভাবে পরস্পরকে পাওয়ার কোনও তুলনা নেই। মিতালী সেই অনাস্বাদিতপূর্ব সঙ্গ চেয়েছিল। পায়নি। আজ, এতকাল পর, আকাঙ্ক্ষার পরিবর্তন এবং মৃত্যু হয়েছে। মিতালী শুভায়নের সঙ্গে বেড়াতে আগ্রহী পর্যন্ত নয়। সে যায় তার বান্ধবীদের সঙ্গে। মিতালীকে ছাড়া শুভায়নেরও কিছু শূন্য লাগে না। সংসার দাম্পত্য সম্পর্কের হাঁড়িকাঠও বটে।

এর মধ্যেই কফিবিপণি ভরে গেছে। তাতে কিছু নয়। পাঁচতারা হোটেলগুলোয় নানাবিধ বৈঠকী ব্যবস্থা আছে। শুভায়ন তারই একটির সন্ধানে যেতে যেতে বলল, 'আপনার আপত্তি না থাকলে আমরা ঘরে গিয়েও বসতে পারি। বারান্দায় বসে বৃষ্টি দেখা যাবে।'

'বেশ তো। চলুন।'

দুটি বিশাল কক্ষ নিয়ে শুভায়নের থাকার ব্যবস্থা। যাকে বলে সুইট। তার একার পক্ষে প্রয়োজন না হলেও এমন ঘরে তার বসবাস নির্ধারিত। সব কিছু দেখেশুনে যামিনী আরও একবার মুগ্ধ হল। চওড়া বারান্দায় এসে তারা বসল। হাওয়ার দাপট কমেছে। বৃষ্টি অল্প পড়ছে। বারান্দার সামনের অংশ ভিজে উঠেছে। শুভায়ন ফোন করে লেবু-চা আনতে বলল। তার সেলফোন বেজে উঠল। সে পাশের ঘরে চলে গেল। চা এল। শুভায়নও কথা বলে ফিরে এল। এবার যামিনীর ফোন বাজল। ফোনটা তার স্বামী কল্লোলের, যে একটি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কের শাখা অধিকর্তা। যামিনী ফোন নিয়ে আড়ালে গেল না। শুভায়নের সামনেই বলল, 'হ্যাঁ, বলো।'

কল্লোল বলল, 'সব ঠিক আছে?'

'হ্যাঁ। তোমাদের?'

'নয়ন এখনও ফেরেনি। ফোন করেছিলাম। বলল বন্ধুর বাড়িতে রিহার্সাল দিচ্ছে। রাত হবে।'

'ও!'

'ও আবার কী! মা ড্যাং ড্যাং করে ঘুরে বেড়ালে ছেলে তো উচ্ছন্নে যাবেই।'

'গানবাজনা করলে কেউ উচ্ছন্নে যায় না কল্লোল।'

'চুপ করো। তোমার জন্যই ও বিপথগামী হয়ে যাচ্ছে।'

'তোমার বাকি কথাগুলো তো আমার জানা। সে না হয় বাড়িতে ফিরেই আরেকবার শুনব।'

'হ্যাঁ। এখন তো আমার কথা শোনার সময়ও তোমার নেই। বাইরে কেন যাও, আমি জানি না।'

'কল্লোল।'

'এনজিও তুমি একলা করো না! আমাদের অনেক অফিসারের স্ত্রীই করে। তারা কেউ ড্যাং ড্যাং করে একলা একলা বাইরে রাত কাটায় না। তুমিও একলা কাটাও না। কার সঙ্গে কাটাও, এই হল প্রশ্ন।'

যামিনী ফোন কেটে দেয়। শুভায়ন তাকে একা কথা বলার সুযোগ দিয়ে, ভিতরে চলে গিয়েছিল। কথা শেষ হয়েছে দেখে আবার এসে বসল। আবার যামিনীর ফোন এল, কল্লোল।

'তুমি ফোন কেটে দিলে কেন?' যামিনী বলল, 'তুমি সুস্থ নেই। কী হবে বলো ফোন

নারী স্বাস্থ্য!

সমস্যা অনেক
উপায় কেবল
হেমপুষ্পা

✔ মানসিক এবং শারীরিক ক্লান্তি দূর করে জীবনে পূর্ণতা ফিরিয়ে আনে।
✔ অনিয়মিত মাসিক সম্বন্ধিত সমস্যা দূর করে।
✔ রক্ত পরিষ্কার করে ও সৌন্দর্য্য ফুটিয়ে তোলে।
✔ হর্মোনাল অসুবিধায় এটা প্রাকৃতিক ভাবে কাজ করে।
✔ রক্তাল্পতা দূর করে সঙ্গে সঙ্গে কোমরে ব্যাথা ও বেদনা দূর করে।
✔ গর্ভাশয় সম্বন্ধিত আয়ুর্বেদিক টনিক।

৮০ বছর ধরে মহিলাদের
No. 1 ঔষধি এবং টনিক

HEMPUSHPA

Samvad-1568/Kolkata

For more information write to : Rajvaidya Shital Prasad & Sons, 23 Darya Ganj, New Delhi - 2, Ph.: 011-23261111
Stockists : Asansole Ph.: 2207193, 9434311289, Burdhwan Ph.: 2566031, Purulia Ph.: 222020, Kolkata Ph.: 22356142, 25551791, 22350018, 22735782, 9433267762, Howrah Ph.: 9830112608, Siliguri Ph.:-2534960, 2531329

ধরে থেকে? এভাবে কথা বললে আমি ফোন অফ করে দেব।'

'একশোবার বলব। নোংরা মাগি। আমি তোকে ডিভোর্স করব।'

যামিনী ফোন সুইচ অফ করে দিল সত্যি। খানিকক্ষণ চুপ করে রইল। আবার সুইচ অন করে ফোন করতে লাগল। শুভায়ন আবার উঠে ভিতরে গেল। শুনতে পেল যামিনী বলছে, 'নয়ন। নয়ন তুই কোথায়? ও! সন্দীপনের বাড়ি? শোন, তোর বাবা আবার ও সব বলছে...হ্যাঁ। আজ আবার। বোধহয় খেয়ে ফিরেছে। তুই আজ সন্দীপনের ওখানে থেকে যা...হ্যাঁ ঠিক আছে।'

যামিনী, শুভায়নের ঢেলে রাখা চায়ে লেবুর টুকরো থেকে রস ফেলে টুপটাপ।

শুভায়ন এসে বসল আবার। বলল, 'চা কি ঠান্ডা হয়ে গিয়েছে?' যামিনী পটের গায়ে হাত রাখল। বলল, 'আছে গরম। কাপের চা বোধহয় ঠান্ডা হয়ে গেল।'

'আর একটা বলি?'

'না-না। কী দরকার? আপনি কি খুব গরম চা ভালবাসেন?'

'না। বরং হালকা গরম।'

'আমিও।'

দু'জনে নিঃশব্দে চা পান করছে। হাওয়ায় স্নিগ্ধ শীতল ভাব। বসন্তের উন্মাদনার ওপর শান্তির স্পর্শ দিয়ে গেল ক্ষণিকের বৃষ্টি। যে এস্রাজ বাজায়, তাকে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর আশীর্বাদ করেন। যামিনী গুনগুনিয়ে উঠল—বরিষ ধরা মাঝে শান্তির বারি। কণ্ঠ খুব সুরেলা নয়। কিন্তু এ হল প্রাণের গান। সুরে-তালে একটু কম পড়লেও ভাব তার সম্পূরণ করে। শুভায়ন নীরবে গান শুনছিল। একবার উঠে বারান্দার বাতি নিভিয়ে এল। গান যে তার ভাল লাগছে, এ তারই সাক্ষ্য। তবু গান শেষ হলে অন্য কোনও গান না করে যামিনী বলে উঠল, 'আমার ছেলে নয়ন—খুব গান-পাগল।'

'একটাই ছেলে আপনার?' এই মামুলি প্রশ্ন ছাড়া আর কী-ই বা সে করতে পারে!

'একটাই। গত বছর মাধ্যমিক পাশ করেছে। মানে এখন সে সতেরো। বন্ধুরা মিলে একটা গানের দল করেছে। যেমন করে এখন ছোটরা। জানেন তো, ও যখন শিশু ছিল, ওকে ঘুম পাড়াতে আমার কোনও কষ্ট ছিল না। এস্রাজ নিয়ে ওর কাছে বসতাম। সুর বাজাতাম। কোনও রাগ। কোনও গানের টুকরো, ও ঘুমিয়ে পড়ত।'

'এখন কী বাজায়?'

'স্প্যানিশ বাজায়। গান করে। খুব সুর ওর গলায়। ও এস্রাজ বাজাতেও পারে। সঙ্গীতের যে কোনও যন্ত্র পেলেই নেড়েচেড়ে দেখা চাই ওর। আমি বাধা দিই না।'

'বাধা দেবেন কেন?'

'কল্লোল, মানে আমার বর এ সব পছন্দ করে না যে!'

'ও!'

'ওর ইচ্ছে নয়ন ডাক্তারি বা ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ুক।'

'আজকাল সবাই তাই চায়।'

'আপনিও কি চান?'

'না-না। আমার বড় মেয়ে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ছাত্রী। ছোটটা খুবই ছোট। আমি বা আমার স্ত্রী ওদের ওপর কিছু চাপাই না। আমি সাধারণ প্রবণতার কথা বলছিলাম। সবাই চায়।'

'কেন চায়? জগতে কি আর কোনও কাজ নেই? আর, একজন চাইলেই তো হবে না, যে পড়বে তার ইচ্ছেটা দেখতে হবে তো? নয়ন বলে, 'মা, আসল কথা তো গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থা! এত বড় বাড়ি আমাদের। আচ্ছাদন তো হয়েই গেল। আর গ্রাসের ব্যবস্থা আমি ঠিক করে নেব মা।' আমি ওর কথা বিশ্বাস করি। মানুষকে চিনতে হয় তার দায়িত্ববোধ থেকে। নয়নের তা আছে। আমি খুব বেশি কথা বলছি, তাই না?'

'কথা বলার জন্যই তো আমরা এসেছি আজ।'

'কী জানি, আপনার সঙ্গে আর কখনও দেখা হবে কি না। আর আসবে কি না এমন কোনও সন্ধ্যা। রবীন্দ্রনাথের সেই গানে আছে না? আর কি কখনও কবে এমন সন্ধ্যা হবে...জনমের মতো হায়, হয়ে গেল হারা—এই জায়গাটা এত ভাল, আপনি এত ভাল শ্রোতা, মনে হচ্ছে সারা রাত কথা বলি। এই সন্ধেটাকে টেনে টেনে ভোর পর্যন্ত নিয়ে যাই।'

শুভায়ন সরকার, যে কি না একজন সফল ডাকসাইটে বিপণন পরিচালক, যে সমস্ত কথা বলে পরিমিত, কাজ করে নিমগ্ন পরিণামদর্শিতায়, সে পেশাগত ব্যক্তিত্বের মধ্যে থেকে অকস্মাৎ কবি হয়ে বেরিয়ে আসে, বলে, 'থাকবেন? দেখুন কত বড় বড় দুটো ঘর। যদি আপনার খারাপ লাগে এই প্রস্তাব, ক্ষমা করবেন।'

'খারাপ লাগবে কেন? দু'জন পরিণতবয়স্ক এবং পরিণতমনস্ক মানুষ কয়েক ঘণ্টা একসঙ্গে কাটালে জগতে কারও কোনও ক্ষতি হয় না। এটা ঠিক আমরা পরস্পরের চেনাজানা নই। কিন্তু তাতে কী? এই বয়সে এসেও লোক চিনতে পারব না।

ঊনচল্লিশ হল আমার। আপনি আমার পক্ষে ক্ষতিকারক হয়ে উঠবেন না, তা বুঝেছি। আমিও নই, নিশ্চিন্ত করতে চাই।'
'আমার ঊনপঞ্চাশ এবং আমি নিশ্চিন্ত।'
হাসল শুভায়ন। বলল, 'কিছু শব্দ আসছে মনে। কবিতা হয়ে উঠতে পারে। লিখে রাখি?'
'রাখুন। দাঁড়ান, আলো জ্বেলে দিচ্ছি আমি। কিসে লিখবেন?'
'ভিতরে টেবিলে লেখার কাগজ-কলম সব আছে, নিয়ে আসছি।'
'আপনি বসুন। ভাবুন। আমি এনে দিচ্ছি।'
যামিনী বারান্দার আলো জ্বেলে ভিতর থেকে নিয়ে এল কাগজ-কলম। শুভায়ন দ্রুত হাতে লিখে ফেলল কয়েক পঙ্‌ক্তি। যামিনী তা পড়তে চাইল না। শুভায়ন কাগজ-কলম টেবিলে রেখে বলল, 'আমার ব্যথা আর নেই। খুব ঝরঝরে লাগছে।' যামিনী হেসে বলল, 'আপনার সকল ব্যথা অক্ষর হয়ে প্রকাশ পেল? বাঃ। কী আশ্চর্য এ জীবন, তাই না? কালও আমরা কেউ কারওকে জানতাম না। আজ আপনার সৃষ্টির সূচনালগ্নে আমি কেমন সাক্ষী হয়ে রইলাম। এই কবিতা যখন সম্পূর্ণ হবে, তখন আমি থাকব না।'
শুভায়ন বলে, 'আমি যদি বলি, নিশ্চয়ই থাকবেন, আপনাকে খুব করে মনে পড়বে আমার—তা হলে তা বানিয়ে বলা হবে। কী হবে—তা আমিও জানি না। আপনাকে কোনও কিছু বানিয়ে বলতে আমার মন চাইছে না। না হলে, জানেনই তো, বিপণন নিয়ে যাদের কাজ, তারা নিজেরাও যা বিশ্বাস করে না, তাকেও অতি বিশ্বাসযোগ্যভাবে প্রতিষ্ঠিত করে।'
'না-না। বানিয়ে বলছেন না বলেই আমার ভাল লাগছে। পরস্পরের মন রাখার কোনও দায় আমি চাই না। ও তো সারাক্ষণ ঘরে বাইরে চলে। কিন্তু শুভায়ন, দুটো কথা।'
'হ্যাঁ, বলুন না।'
'এক, এখানে থাকতে গেলে আমার রাত্রিবাসের পক্ষে প্রয়োজনীয় কিছু জিনিস আনতে হবে।'
'সেটা কোনও সমস্যা নয়। আর একটু পরে আমরা গাড়ি নিয়ে মন্দির মার্গে চলে যাব। দ্বিতীয় কথাটি কী?'
'আপনার স্ত্রীর নাম কী?'
'মিতালী।'
'আপনি কি মিতালীকে বলবেন, আমি আপনার সঙ্গে থাকছি? আমি কল্লোলকে বলতে পারব না। যদি আমার এই গোপনীয়তায় আপনার আপত্তি না থাকে, আমি থাকব। কারণ দু'জনের একজন সঙ্গোপন প্রত্যাশা করলে অপরজনকেও তার দায়িত্ব নিতে হয়।'
'আমিও মিতালীকে বলতে পারব না। বলতে পারি না। এমন ঘটনা তো প্রতিদিন ঘটে না। সত্যি বলতে কী, আগে কখনও ঘটেনি। তবু মিতালীকে আমি সব আনন্দ, সব মুগ্ধতা, সব আশঙ্কার কথা বলতে পারি না।'
'কেন পারেন না?'
'যখন বিয়ে হল, ভাবলাম এর সঙ্গেই তো সব কিছু ভাগ করে নেওয়ার কথা আমার। সব বলতাম। ফল হল উলটো। যদি অফিসের কোনও দুশ্চিন্তার কথা ওকে বলতাম, ও আমার চেয়েও বেশি উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ত। মনে হত যেন আমার চাকরিটাই যেতে বসেছে। নানা রকম পরামর্শ দিত আমাকে। এই করো, ওই করো। এতেই শেষ হত, তা নয়। পরে আমাকে ফিরিস্তি দিতে হত কী করলাম। ওর কথামতো চললাম কি না। না চললে খুব রাগ করত। আমার শিক্ষার স্তর, আমার সাহস, পরিশ্রমের ক্ষমতা, আমার অভিজ্ঞতা, সব কিছুর ওপর থেকে ওর আস্থা চলে যাচ্ছিল। বুঝলাম, একসঙ্গে বসবাস, সন্তানের জন্ম দেওয়া, অসুখ-বিসুখে রাত জাগা মানে যতখানি দাম্পত্য, সকল বোঝা ভাগ করে নেওয়া ততখানি দাম্পত্য নয়। এ গেল আশঙ্কা ভাগাভাগির ইতিহাস। এবার মুগ্ধতার কথা বলি?'
'বলুন, শুনি।'
'আমার প্রিয় বন্ধু শ্রীরূপ। ওই যার কথা বললাম, মনের ডাক্তার। ও যখন বিয়ে করল, তখনও আমার বিয়ে হয়নি। ওর বউ সুমনাও আমার বন্ধু হয়ে উঠল। একবার এরকমই এক বসন্তে আমরা বেতলা অরণ্যে বেড়াতে গেলাম। এক ভোরে আমরা

হাতিতে চেপে ঘন জঙ্গলে যাচ্ছি। সুমনা সাদা ট্রাউজারের ওপর ঘন সবুজ শার্ট পরেছে। ভোরবেলায় উঠে পলাশ কুড়িয়েছিল। বনবাংলোর এক বালিকা কর্মী তাই দিয়ে মালা গেঁথে ওকে পরিয়ে দিয়েছে। একরাশ ঘন কালো চুল পিঠের ওপর ছড়ানো। বললাম, 'সুমনা, তোকে বনদেবীর মতো দেখাচ্ছে।' ও বলল, 'দেখাচ্ছে? তা হলে ছবি তোলো।' অনেক ছবি তুলেছিলাম ওদের। সে সবের কপি আমাদের ফোটো অ্যালবামে সাজানো ছিল। মিতালীকে দেখাতে গিয়ে পুরো গল্পটা করলাম। সবই হাসিমুখে শুনল। কিন্তু গোলমাল হল শ্রীরূপ আর সুমনা আসার পরে। আমার বিয়ের সময় ওরা বিদেশে ছিল। এল যখন, খুব উৎসাহ। শ্রীরূপ আমাদের নিয়ে উটি যেতে চাইল। মিতালী কিছুতেই সম্মত হল না। সুমনার সঙ্গে কথা বলল না ভাল করে। দিন কয়েক গুমরে গুমরে একদিন ফেটে পড়ল। আমি নাকি সুমনাকে দেখেই উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠি। ওর প্রতি বিশেষ মুগ্ধতা না থাকলে কেন ওর ছবি তুলে অ্যালবামে সাজিয়ে রেখেছি। বিদেশ থেকে ওরা চিঠি লিখত আমাকে। দেখলাম সে সব সংগ্রহ করেছে। তার মধ্যে গোপন করার কিছু ছিল না। কিন্তু বন্ধুর স্ত্রী কেন চিঠি লিখবে? এর মধ্যেই মিতালী ওর প্রার্থিত রহস্য এবং অনৈতিকতা খুঁজে পেল। আর আমি আমার মুগ্ধতার কথা গোপন করতে শিখলাম। আজ যদি আমাদের দেখা না-ও হত, যদি কালকের উড়ানে আপনি আমাকে যেভাবে শুশ্রূষা করেছেন—সেখানেই সব থেমে যেত, তবু এর কিছুই ওকে বলতাম না।'
'আমার গল্প আপনার থেকে খুব কিছু আলাদা নয়। কল্লোলের বৈশিষ্ট্য হল ও কর্তৃত্ব পছন্দ করে। আমরা সবাই ওর অধীনস্থ বলে ওর ধারণা। ও চায় না আমি চাকরি করি। কিন্তু আমি ছাড়িনি। ও সন্দেহ করে, কাজের জন্য যে আমি বাইরে বাইরে ঘুরি, আমার সঙ্গে কেউ রাত্রিবাস করে। আচ্ছা, কেন এমন ভাবে বলুন তো? আমার শাশুড়ি যতদিন ছিলেন, এই ভাবনায় উস্কানি দিয়েছেন। কিন্তু কেন? ছেলেরা যখন অফিসের কাজে ট্যুরে যায়, তখন তো কোনও সন্দেহ কেউ করে না। হ্যাঁ, এরকম হয়েছে যে আমাদের সংগঠনের আর কেউ আমার সঙ্গে কোথাও গেছেন। কোনও মেয়ে হলে একঘরে থেকে গেছি। পুরুষ হলে আলাদা ঘর নিয়েছি। কখনও মনে হয়নি, এই সুযোগে কারও সঙ্গে একটু শরীর-শরীর খেলে নিই। এই তো মওকা। আরে, এরকম হয় নাকি। পুরুষ পেলেই কি হয়? একজন মেয়ে, যে স্বাধীনভাবে কাজ করে, সে স্বাধীনভাবে একা ঘোরাফেরা করলে দোষ দেখা হবে কেন? কল্লোল খুব সেকেলে। খুব সংস্কারগ্রস্ত। মধ্যযুগীয়। ও চায় না নয়ন গান নিয়ে মেতে থাকুক, নয়ন পরোয়া করেনি। ও যত আমাদের নিয়ন্ত্রণ করতে ব্যর্থ হয়েছে, তত ক্ষেপে উঠেছে। আমাদের বাড়িটায় এখন দুটো আলাদা দ্বীপ। একটায় কল্লোল, অন্যটায় আমি আর নয়ন। যদি নয়ন না থাকত, আমি এই বয়সেও বিবাহবিচ্ছেদের কথা ভাবতাম।'
ফোয়ারা উছলে চলেছে নিরন্তর। সাত রং খেলা করছে। ঘুমজড়িত স্বরে প্যাঁকপেঁকিয়ে উঠল হাঁস। বৃষ্টি নেই আর। কোনও ঘর থেকে হাসির শব্দ আসছে। পতঙ্গরা উড়ে উড়ে দেওয়ালে এসে বসল। শুভায়ন ও যামিনী দু'জনেই নিজের নিজের অনেক কথা বলে ফেলার পর এখন স্তব্ধ। এই নীরবতার ফাঁকে ঢুকে পড়ছে সেলফোনের বাজনা। শুভায়নের কাজের ফোন, যামিনীর কাছে এল কল্লোলের ফোন। যামিনী কিছুক্ষণ কানে চেপে বলল, 'কল্লোল চুপ করো। তুমি

‘যামিনী, আমি জানি না আপনাকে ছুঁলে আমার আর কোনও ইচ্ছা জেগে উঠবে কি না। যামিনী, আমি আপনার অবিশ্বাসের কারণ হতে চাই না।’

সীমা ছাড়িয়েছ...কল্লোল চুপ, চুপ...আমার এপ্রাজে হাত দেবে না তুমি। খবরদার বলছি...যদি ফিরে দেখি কোনও ক্ষতি তুমি করেছ কল্লোল, তোমাকে খুন করব আমি! খুন! হ্যাঁ খুন!’ চাপা হিসহিসে গলায় কথাগুলো শেষ করল যামিনী। ফোনের সুইচ আবার অফ করে দু’হাতে মুখ ঢাকল। কিছুক্ষণ পর সব ঝেড়ে ফেলে সটান উঠে দাঁড়াল সে। বলল, ‘চলুন। যাওয়া যাক।’

যেতে যেতে কাজের কথা হল। যামিনী যে এনজিও-তে কাজ করে তার নাম ‘বোধি।’ যে সব পথশিশু কিংবা বস্তিবাসী শিশু-বালক-কিশোর নেশাচক্রে জড়িয়ে যায়, তাদের নেশা ছাড়ানোর কাজ। ‘বোধি’-র প্রতিনিধি হয়ে বিভিন্ন অধিবেশনে কিংবা আর্থিক সহায়তা দানকারী সংস্থায় যামিনীকে যেতে হয়। কাজ ব্যাখ্যা করতে হয়। অনুদানপ্রদায়ী সংস্থার বিশ্বাস অর্জন করতে হয়। সবসময় সব জায়গায় যে বিমানে যেতে পারে তা নয়। যখন যেমন জোটে। শুভায়ন জানতে চাইল, ‘সাফল্যের হার কে মন?’

যামিনী বলল, ‘শিশুদের ক্ষেত্রে খারাপ নয়। কিন্তু নয়-দশ বছর থেকে ষোলো—এই বয়ঃক্রমে নেশা ছাড়ানো শক্ত কাজ। ওদের মধ্যেও জানেন, ওই বয়সেও অপরাধবোধ এবং হতাশা কাজ করে। ওই অত ছোট সব ছেলে, ছেলেরাই নেশা ধরে বেশি—কী অন্তর্মুখী! নিজের কথা কিছুতে বলতে চায় না। নেশা ছাড়তে আগ্রহী এরকম ছেলেদের জন্য আমাদের একটা বাড়ি আছে। নেশার বস্তু না পেয়ে যখন ওরা শারীরিক যন্ত্রণা পায়, এমনকী মনের কষ্টেও আর্তনাদ করে, বাকিরা তাকে ঘিরে বসে থাকে। ওই স্তর ওরা পেরিয়ে এসেছে। এরকম যন্ত্রণাকাতর ছেলেদের আমি স্পর্শ করি, যখন ওখানে যাই। ওরকম মমতার কাছে ওরা কীভাবে আত্মসমর্পণ করে ভাবতে পারবেন না। এত বছর ধরে এত নতুন মুখ—সবাইকে আমার এক লাগে। আর্ত, কাতর। ওদের ছুঁয়ে ছুঁয়ে আমার স্পর্শ বিষয়ক লজ্জা বা সংস্কার চলে গেছে। তার কাজের বিচিত্র অভিজ্ঞতার কিছু সে বর্ণনা করে কিন্তু ফেরার পথে একেবারে চুপ করে যায়। হোটেলে ফিরে স্নানাহার সেরে নেয় দু’জনে। যত কথা হয়েছিল সন্ধে থেকে, যত কবিতা গান জীবনের উন্মোচন—সব মূক হয়ে গেছে। সারা রাত্রি জেগে ভোর পর্যন্ত কথা বলা হয়ে উঠল না। যামিনী বলল, ‘একটু শুয়ে থাকি? মাথায় যন্ত্রণা করছে।’

‘মাইগ্রেন?’ জানতে চাইল শুভায়ন।

‘হ্যাঁ ওরকমই।’

‘শুয়ে পড়ুন। রাতে প্রয়োজন হলে ডাকবেন।’

শুয়ে শুয়ে আরাম হল না যামিনীর। সে উঠে বসল। বসে বসেও আরাম হল না। সে পায়ে পায়ে চলে এল বারান্দায়। ভাবল, শুধু শুধু এখানে থাকতে এলাম। সেই মুহূর্তে কেন অত আবেগপ্রবণ হয়েছিলাম। মন যেন হঠাৎ কোনও বন্ধন থেকে ছাড়া পেয়েছিল। মানুষটি ভদ্র। অতি ভদ্র। কী সুন্দর কথায় কথায় পঙ্‌ক্তি রচনা করলেন। ব্যথার সঙ্গে ব্যথার দেখা। সমুদ্দুরে। তার পর...যন্ত্রণা সব ভুলিয়ে দিল। সে অন্ধকারে বসে রইল একাকী। বড় উত্তেজিত হয়ে উঠেছিল। কল্লোল বলেছে, ‘ভেঙে টুকরো টুকরো করে দেব তোমার এস্রাজ।’ যদি ভাঙে। যদি ভাঙে।। ওর কাছে এস্রাজ নিরাপদ নয়। কোনও বাজনা নিরাপদ নয়। কোনও নির্ভরতা নিরাপদ নয়...যামিনী ভাবে, যদি ওর সব ইচ্ছা মেনে নিতাম আমি আর নয়ন, তা হলে কী হত...ভাবে আর ব্যথা বৃদ্ধি পায়। ভাবে, অন্যের ইচ্ছার দাসত্ব গ্রহণ করে কপট শান্তির দেওয়া-নেওয়া, সেই কি সার্থকতা জীবনের? নাকি স্বাধীনতার জন্য দুঃখভোগ! মেনে তো নিয়েছি ওকে। ওর তীব্র কামতাড়না, ওর ক্রোধ, সন্দেহপ্রবণতা, ওর মদ খেয়ে হুজ্জোতি, এমনকী...এমনকী...

‘যামিনী!’ শুভায়ন উঠেছিল। যামিনীকে দেখতে পেয়ে এসেছে।

যামিনী বলল, ‘বসুন।’

‘ঘুম আসছে না?’

‘না।’

‘ব্যথা করছে? খুব?’

‘করছে।’

দু’জনে বসে রইল চুপ করে। শুভায়নের কষ্ট হল। সে তো স্পর্শের শুশ্রূষা জানে না। সে কী করে? কী করলে যামিনী একটু আরাম পায়? সে বলল, ‘কোনও ওষুধ নেই?’

‘আছে। সঙ্গে নেই।’

‘যামিনী, আমি জানি না আপনাকে ছুঁলে আমার আর কোনও ইচ্ছা জেগে উঠবে কি না। যামিনী, আমি আপনার অবিশ্বাসের কারণ হতে চাই না।’

‘ভয় নেই। আমি সেরে উঠব। আপনার কবিতা—ব্যথার সঙ্গে ব্যথার দেখা। সমুদ্দুরে। তার পর কী?’

‘তার পর? ও তো তখন বানিয়েছিলাম। ওমনি বানানো যায়।’

‘মনে নেই?’

‘ব্যথার সঙ্গে ব্যথার দেখা। সমুদ্দুরে। নোনা জলের ঢেউ এসে ওই ভাসিয়ে দিল অনেক দূরে। কোথায় সে দূর? নেই সীমানা। ব্যথার কথা অন্য ব্যথার হয়নি জানা। এই তো। যামিনী ঘুমের ওষুধ খাবেন? আছে আমার কাছে।’

‘যদি ঘুম ভাঙতে দেরি হয়? কাল সকালে যে আপনার উড়ান।’

‘ও নিয়ে ভাববেন না। চলুন, ওষুধ খেয়ে একটু ঘুমোবার চেষ্টা করুন যামিনী।’

‘কবিতাটা লিখে রাখবেন শুভায়ন। এর মানেটা যেন ধরতে পেরেছি। ভাল লাগছে।’

‘লিখে রাখব।’

২

মাইগ্রেনের ব্যথাসমেত অধিবেশনে যোগ দিতে গেল যামিনী। শুভায়ন কলকাতা বিমানবন্দর থেকে সোজা এল তার আপিসে। কাজে ব্যস্ত ছিল। মিতালীর ফোন এল।

‘কখন ফিরছ?’

শুভায়ন বলল, ‘এখনই কী করে বলি। কেন? কী হল?’

‘সুরমার সঙ্গে তোমার মা আবার ঝগড়া বাধিয়েছেন। চোর বলেছেন ওকে। ও কান্নাকাটি করছে। বলছে থাকবে না আর।’

‘ওকে বোঝাও। ও তো জানেই মা এরকম।’

‘আমি আর বোঝাতে পারব না। তোমার মা, তুমি এসে বোঝাও। এত করছি ওঁর জন্য, অথচ আবাসনের সব বাড়িতে গিয়ে আমার নামে নিন্দে করেন।’

‘আচ্ছা আমি বাড়িতে যাই, তারপর দেখছি। তুমি সুরমাকে একটু শান্ত করো।’

‘শান্ত করো, শান্ত করো। তোমার আর কী? অফিসের নাম করে গায়ে হাওয়া লাগিয়ে ঘুরে বেড়াও। মেয়েদের স্কুল-কলেজ, গাড়ির ড্রাইভার, ট্যাক্স, ব্যাঙ্ক, বারোয়ারি পুজোর চাঁদা, আত্মীয়ের শ্রাদ্ধ থেকে অন্নপ্রাশন, বাড়ির কাজের লোক, তোমার মা—সব হ্যাপা আমার ঘাড়ে।’

মিতালী ফোন রেখে দিল। শুভায়ন কপাল টিপে বসে রইল কিছুক্ষণ। মিতালীর কথার জবাব সে দিতে পারত। বলতে পারত, আমি অফিসের নাম করে গায়ে হাওয়া লাগিয়ে বেড়াই বলেই তোমরা গাড়ি চাপতে পারো, বাইশশো স্কোয়্যার ফুটের ফ্ল্যাটে থাকতে পারো, মেয়েদের নামী স্কুল-কলেজে পড়াতে পারো, দশ হাজার টাকার শাড়ি, হিরের গয়না, সিঙ্গাপুর-মালয়েশিয়া-মিশর ভ্রমণ করতে পারো...বলতে পারত সে, কিন্তু বলল না। টের পেল, ব্যথাটা একটু একটু করে ফিরে আসছে।

সারাদিনের কাজের পরে বাড়ি ফিরল যখন, পরিস্থিতি থমথমে। মেয়েরা পড়াশোনা করছে। সুরমা রান্নাঘরে। মিতালী গম্ভীর মুখে টেলিভিশনে সংবাদ শুনছে। শুভায়ন আর মায়ের ঘরে গেল না। স্নান সেরে খাবার

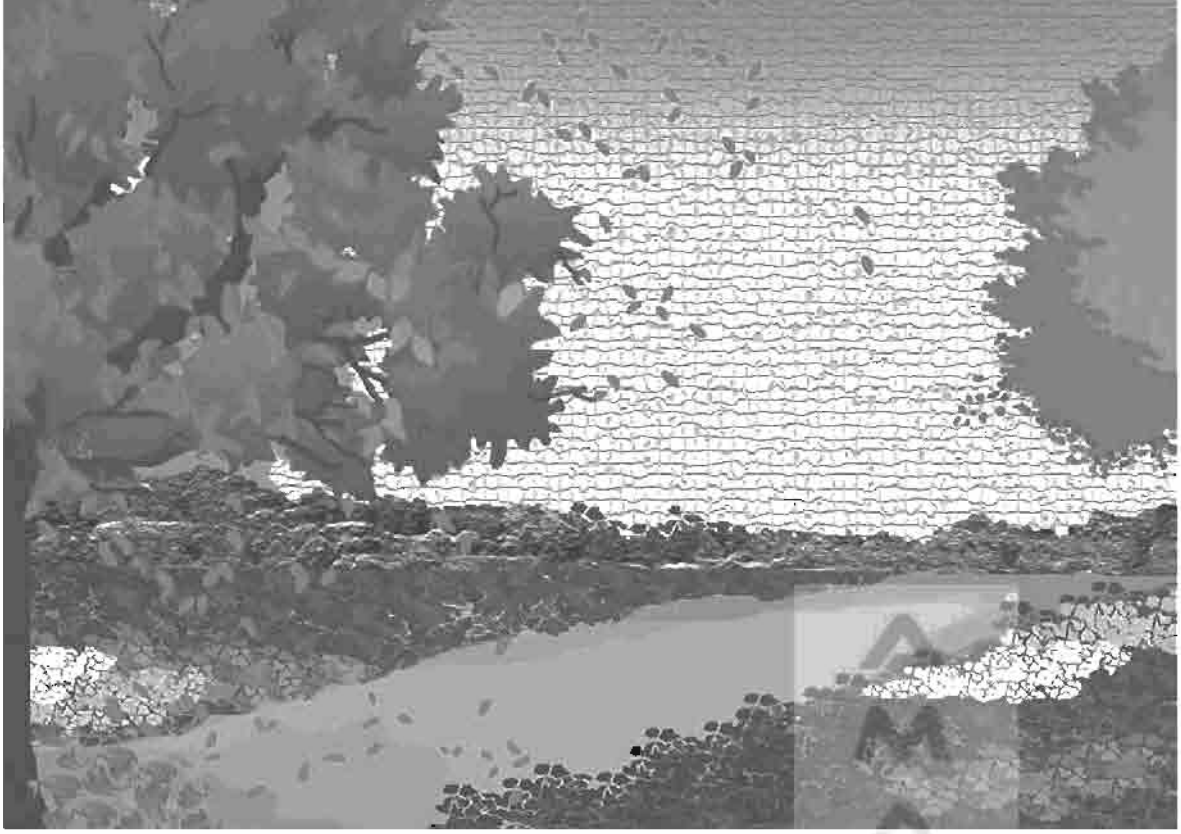

টেবিলে বসল। সুরমা নীরবে খেতে দিল। খাওয়া শেষ করে শুভায়ন তার ছোট্ট পড়ার ঘরে এল। গতকালের উৎসারিত পঙ্‌ক্তিগুলি নিয়ে বসল। কয়েকখানি অক্ষর মাথায় আসছে, যাচ্ছে। হয়তো এবার কবিতা সম্পূর্ণ হবে। তার আগে—ব্যথার সঙ্গে ব্যথার দেখা। সমুদ্দুরে। লিখে রাখা দরকার। এমনি সরল পঙ্‌ক্তি সে অনেক তৈরি করতে পারে। কিন্তু একালের কবিতা আর সরল নেই। তবু একজনের তা ভাল লেগেছে। তার সঙ্গে আর কি কখনও দেখা হবে? হয়তো না। তবু তার ভাল লাগার পঙ্‌ক্তি লিখে রাখতে হবে। সে কলম নিল হাতে। মিতালী ঘরে এল। বলতে শুরু করল, 'মেয়েদের টিফিন দেব বলে মিষ্টি এনে রেখেছিলাম। মা সব চুরি করে খেয়েছেন।'

'আবার এনে নাও।'

'সে তো নিতেই পারি। নাতনিদের জন্য রেখে খেলে কী হত?'

'তা কী করতে বলো? মিষ্টি খেয়েছে বলে মাকে বকাবকি করব? জানোই তো মা এরকম।'

'শুধু মা কেন, তুমি কীরকম তাও জানি। বৃথাই তোমাকে বলতে আসা। ঘরে এলেন, খেলেন-দেলেন, কাব্যি করতে বসে গেলেন। কে পড়ে তোমার কবিতা? ক'টা বই আছে? কোন পুরস্কার পাও? কে চেনে তোমায় কবি বলে?'

'সামান্য কারণে এত মাথা গরম করছ কেন?'

'সামান্য কারণ? সামান্য কারণ? তোমার মা নিজে চুরি করে অপরকে চোর বলবেন, তোমার মা সারা আবাসনে আমার নিন্দে করবেন, তোমার মায়ের শরীর খারাপ হলে আমাকেই ডাক্তারের কাছে নিয়ে যেতে হবে, দিনে একশোটা কথা মিথ্যে বলবেন তিনি—আর তুমি বলবে সামান্য কারণ?'

'আস্তে মিতালী, আস্তে। কাল থেকে ব্যথাটা ফিরে এসেছে। কষ্ট হচ্ছে আমার।'

'চমৎকার কল করেছ বলো! মাথার ব্যথা না ভূতের চাঁটি কেউ জানে না।'

মিতালী তেতো হাসে। শুভায়ন দু'হাতে মাথা টিপে বসে থাকে চুপ করে। কাল দ্বিতীয় শনিবার। তার ছুটির দিন। ভাবে মায়ের সঙ্গে কথা বলবে। কিন্তু কী বলবে? ঊনসত্তর বছর বয়স শোভাদেবীর। কোনও অসুখ নেই শরীরে। কিন্তু বিচিত্র সব মনের অসুখ। যা পান, নতুন শাড়ি জামা—সে যারই হোক, নিজের আলমারিতে তালা দিয়ে রাখেন। রেফ্রিজারেটার খুলে যা পান, সব খেয়ে ফেলেন। নেমন্তন্নবাড়িতে গিয়ে এমন অতিরিক্ত আহার করেন, পরদিনই বিশ্রী বদহজম হয়। নিজের শাড়ি নোংরা করেন, শৌচালয় নোংরা করেন। শুভায়ন রাগারাগি করেছে কত, বকাবকি করেছে, ফল হয়নি কিছু। আবাসনে যে শোভাদেবী কেবল মিতালীর নিন্দা করেন তা-ই নয়, পুত্রনিন্দাও রটান। শ্রীরূপের সঙ্গে কথা বলেছিল শুভায়ন। শ্রীরূপ শোভাদেবীকে বোঝানোর চেষ্টা করেছিল যে তিনি মনোরোগে ভুগছেন। শোভাদেবী মানেননি। এই দেশ ভারতবর্ষ এডস রোগ পর্যন্ত স্বীকার করতে প্রস্তুত, কিন্তু মনোরোগ নয়। শ্রীরূপের প্রচেষ্টার পর শোভাদেবী আত্মীয়-স্বজন যেখানে যত আছে, সকলকে ফোন করে করে বলেছেন, শুভ আর তার বউ মিলে ডাক্তার ডেকে আমাকে পাগল বানাতে চাইছে। আমার সব গয়না-টাকা হাতাতে চায়। সে এক বিশ্রী ব্যাপার। মিতালী সব দেখেছে, সব জানে। মায়ের প্রত্যেক অন্যায় আচরণে শুভায়ন মিতালীর পক্ষ নিয়েছে, মাকে তিরস্কার করেছে। তবু মিতালী সুখী নয়। সে কবিতা স্থগিত রেখে শুতে গেল। গত রাতে ভাল ঘুম হয়নি। যামিনী দামের কথা খুব বেশি করে মনে পড়তে লাগল। সৌন্দর্যের বিচারে মিতালীর দশ হাতের মধ্যে যামিনী দাঁড়াতে পারবে না। কিন্তু এই প্রথম শুভায়নের মনে হয়েছে যামিনী একমাত্র তার সারাজীবনে দেখা একজন স্বচ্ছ নারী, যে নিজেকে বুঝতে দেয়। তার ইচ্ছে করল ফোন করে যামিনীর খোঁজ নেয়। যদি মিতালী কিছু মনে করে? কী মনে করবে? সে তো হামেশাই একে তাকে ফোন করে। খোঁজখবর নেয়। সে তালিকা থেকে যামিনীর নাম খুঁজে সংযোগ করল। ওপারে যামিনীর ক্লান্ত বিষণ্ণ স্বর, 'ভাবছিলাম, আপনি হয়তো ফোন করবেন।'

'কেমন আছেন?'

'কাল কী সুন্দর কেটেছিল সন্ধ্যা। আজ ফাঁকা লাগছে।'

মিতালী ঘরে এসেছে। শুভায়ন একবার দেখে, একটু কেশে বলল, 'সুস্থ আছেন তো?' হালকা হাসির আওয়াজ এল ফোনে। যামিনী বলছে, 'মিতালী আছেন কাছে, না? কাল আপনি যে ওষুধ দিয়েছিলেন, কিনে এনেছি। এবার খেয়ে শুয়ে পড়ব।'

'সেই ভাল।'

'এখানে কলকাতার মতো নয়। ডাক্তারের লিখিত নির্দেশ ছাড়া ওষুধ দিতে চায় না।'

'তার পর?'

'একজন ওড়িশি সহকর্মীকে বললাম। তিনি তাঁর ডাক্তার বন্ধুকে দিয়ে লিখিয়ে দিলেন।'

'যাক্। রাখি তা হলে?'

'বেশ।'

শুভায়ন শয়ন করল। আজ তার হাঁটা হয়নি।

কাল ভোরে বেশি করে হেঁটে নিতে হবে। সে চোখ বন্ধ করল। কিন্তু ঘুম এল না। ক্লান্তি সত্ত্বেও, নিরন্তর যন্ত্রণা সত্ত্বেও তার শরীর কামার্ত হয়ে উঠল। বন্ধ চোখের তারায় ফুটে উঠল যামিনী। শুভায়ন ভয়ে চোখ খুলে ফেলল। স্নানাগারে গিয়ে ভাল করে ঠান্ডা জলে ধুয়ে নিল মুখ-হাত-পা। পুনরায় শয়ন করল যখন, সে বুঝল, আজ তার নিস্তার নেই। কেন এমন হল? মিতালী ছাড়া কোনও নারীকে সে কামনা করেনি। আজ এই ঊনপঞ্চাশ বছর বয়সে সে কি অনৈতিক কোনও কাজ করতে চলেছে? মিতালী শুতে এলে সে গভীর আকাঙ্ক্ষায় স্ত্রীকে জড়িয়ে ধরল। মিতালী ঠেলে সরিয়ে দিল না। কিন্তু হিস্‌হিস্‌ করে বলল, 'দেখেছ তোমার স্বরূপ? সংসারের কথা বলতে গেলে তোমার কোন দুর্বোধ্য ব্যথার উৎপাত হয়। আর এ সবের বেলা? এই তো চাও তুমি? নাও। নিজেই টেনে তুলল রাতপোশাক। তার ভাষা ও ভঙ্গির কদর্য প্রকাশে এক মুহূর্তে সমস্ত তাড়না উধাও হয়ে গেল শুভায়নের। সে বলল, 'ব্যথাটা মিথ্যে করে বলিনি আমি মিতালী, তৎসত্ত্বেও যদি আমার শরীর জাগে, আমি কার কাছে যাব বলো তোমার কাছে ছাড়া?'

'চমৎকার। দেখো তুমি কী। কীরকম স্বার্থপর! একবার জানতে চেয়েছ—আমার ইচ্ছে আছে কি না? কুকুরের মতো কামড়াকামড়ি শুরু করলে আসতেই। ছিঃ! তুমি নাকি শিক্ষিত প্রগতিশীল পুরুষ!' আলিঙ্গন মুক্ত করল শুভায়ন। বেত্রাহত তস্করের মতো সে সরে এল শয্যার কিনারে। মিতালী ফের একবার বলল, 'করবে তো

করো।' শুভায়ন এল না দেখে বলল, 'ন্যাকা!' বলে শুভায়নের বিপরীতমুখে পাশ ফিরল।

৩

সল্টলেক পল্লির উদ্যানগুলি বসন্তে বিমুখ করে না কারওকে। শুভায়ন সরকার যখন দ্বাদশ পাক দিচ্ছে, তখন তার মাথায় পড়ল একটি রুদ্রপলাশের ফুল। নাট্যকার দীনেশ অধিকারী ঘটনাচক্রে সেই মুহূর্তে শুভায়নের পাশে পাশে হাঁটছিলেন। রুদ্রপলাশের বাসন্তী কৌতুকে তিনি হা-হা রবে হেসে উঠলেন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁরই হাসির প্রতিধ্বনি উঠল অল্প দূরে। সমবেত সেই হাসি সৈনিকদের ছন্দোবদ্ধ পদক্ষেপের মতো। তা শুনে দীনেশ অধিকারী গম্ভীর হয়ে গেলেন। বললেন, 'লাফিং ক্লাব। ছ্যাঃ। হাসি নিয়েও ব্যবসা করতে ছাড়ল না মানুষ। হা হা হা হো হো হো—মনের ব্যায়াম হচ্ছে! ধুর ধুর! মনের ব্যায়াম হয় প্রেমে। নতুন করে প্রেমে পড়ো। সারা জীবন কারও না কারও প্রেমে পড়তেই থাকো। তুমি যখন লেংচে হাঁটবে, মুখ বাঁকা, গাল তোবড়ানো, চামড়া শিথিল, এক হাতে স্নায়ুবৈকল্য—তখনও যেন তোমার জন্য কেউ আকুল হয়ে পথ চেয়ে থাকে! বুঝলে? বুঝলে?'

দীনেশ অধিকারী কথা বলতে ভালবাসেন। তাঁর সঙ্গে দেখা হলে শুভায়ন অসুবিধেয় পড়ে, কারণ বাহাত্তর বছরের দীনেশ ঊনপঞ্চাশের শুভায়নের সঙ্গে চলার গতিতে পেরে ওঠেন না। অথচ শুভায়নকে দেখামাত্র তিনি কথা শুরু করেন আর তাকে গতি কমাতে হয়। গতি কম হলে ঘাম ঝরবে কম, নির্দিষ্ট পরিক্রমণ শেষ করতে সময় লাগবে বেশি। আজ দশম পরিক্রমায় দীনেশ জুটেছেন। তবে সুবিধা এই যে তাঁর কথার রসে বিষাদ ধুয়ে যায়। শুভায়নের মন ভাল হয়ে যাচ্ছিল। সে বলল, 'আপনার এখন কততম প্রেম চলছে দীনেশদা?' দীনেশ বললেন, 'আরে ভাই, গুণে কি আর রেখেছি? বাইরেকার কথা তো ছেড়েই দাও।

বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ ৯৮৩১৫ ৮১০০২

ঘরের মধ্যে আমার প্রেয়সী যখন কথা বন্ধ করে নিঃশব্দে নিদ্রা যান, আমি প্রতিদিন তাঁর প্রেমে পড়ি। কিন্তু জাগ্রতা দেবী মুখ খুললেই বুঝি সেই প্রেম কেবল আমারই একতরফা।'

এবার শুভায়ন হা-হা রবে হাসে। সঙ্গে সঙ্গে তারও হাসির সমবেত প্রতিধ্বনি হয়। ছন্দোবদ্ধ। যান্ত্রিক। হাঃ হাঃ হাঃ। হোঃ হোঃ হোঃ। উঠছে বসছে হাত নাড়ছে পা নাড়ছে আর হাসছে। শুভায়ন ওদিকে দেখল। মিতালী বলে, শুভায়নের হাসি কম, তাকে হাসির ক্লাবেই ভর্তি করে দেওয়া উচিত। হঠাৎ তার মনে হল, যামিনী কতখানি হাসে? হাসলে তার গালে টোল পড়ে। তার মধ্যে এক অপরূপ উচ্ছ্বাস আছে! সামনে আরও একটি রুদ্রপলাশের গাছ। শুভায়ন একটু থমকাল। বৃক্ষতল আলো করে আছে ঝড়ে পড়া আগুনরঙা ফুলগুলি। প্রতিদিন এদের মাড়িয়ে যায় সে, নজর করে না। তার বুকের মধ্যে কী একরকম কষ্ট হয়! প্রতিদিন, জীবনের কত ছোট ছোট মাধুর্য উষ্ণতা আনন্দ উপেক্ষা করে মাড়িয়ে চলে যায় মানুষ। সে দীনেশের দিকে তাকিয়ে লাজুক হাসে। বলে, 'দাঁড়ান দীনেশদা, ক'টা ফুল কুড়োই।'

'হা হা হা। কুড়িয়ে কাকে দেবে?'

'আপনাকেই যদি দিই।'

'দিলে নেব। কিন্তু কিছু গৃহিণীর জন্য নিয়ে যাও। হঠাৎ ফুল দিলে অবাক হবেন না, তা নয়। তবে মনে মনে নিশ্চিত প্রীত হবেন।'

শুভায়ন রুমাল বার করে বাঁ হাতে পেতে নিল। প্রথমে এক অঞ্জলি ফুল দিল দীনেশের হাতে। আবার রুমাল ভরে আলতো গিঁট দিয়ে বাঁ হাতে ঝুলিয়ে নিল। এবার বাড়ি ফেরার পালা। যেতে যেতে তার মনে হল, দীনেশদার কথামতো সত্যিই কি মিতালীকে এই ফুল দিতে পারবে সে? যামিনী হলে অনায়াসে পারত। যামিনীর কথা মনে আসে কেন? হঠাৎ দেখা হওয়া একজন—এ সব সাক্ষাতের কোনও পরিণতি নেই। অথচ সে নিশ্চিত যামিনী এই ফুল উপহার পেলে উছলে উঠত। কিন্তু মিতালীর প্রতিক্রিয়া সে জানে না। সে ক্রুদ্ধ হতে পারে, বিরক্ত হতে পারে, আবার খুশিও হতে পারে! সময় যদি নয়—তা হলে মানুষকে বোঝার পক্ষে কোন বিষয় উপযোগী? আসলে ব্যক্তি আপনাকে আপনি ধরা না দিলে তাকে চেনা শক্ত!

শুভায়ন ভাবনার সঙ্গে সঙ্গে পথ পেরোল। সে বাড়ি পৌঁছল যখন, মিতালী তখনও জাগেনি। তুতুল-মিতুল দুই মেয়ে দাঁত মাজছে। সুরমা রান্নাঘরে। শুভায়ন শোবার ঘরে ঢুকে মিতালীর পাশে বসল। আলতো হাত রাখল মাথায়। তাদের সংস্থায় কর্মীদের অনুপ্রাণিত করার কিছু লক্ষ আছে। তার মধ্যে একটা হল—কাল যা হয়েছে হোক, আজ একটা নতুন দিন।

শুভায়নের স্পর্শে মিতালী অল্প চোখ খুলে অল্প মাথা তুলে বিরক্তভাবে বলল, 'কী হল?'

'ওঠো! উঠবে না?'

'কী এমন বাজে যে ডাকাডাকি করছ?'

'এই দেখো, কী এনেছি তোমার জন্য।'

'কী এটা?'

'পার্কে অনেক রুদ্রপলাশ পড়ে আছে। কুড়িয়ে আনলাম।'

মিতালী ফের বালিশে মাথা রেখে বলল, 'তোমার মায়ের সঙ্গে তোমারও মাথার চিকিৎসা দরকার।'

'ফুল কুড়োলে বুঝি পাগলামো করা হয়?'

'না-না, ভুল বলেছি। আমার মনে রাখা উচিত ছিল তুমি কবি। তা ফুল তো দেওয়া হল। এখন কী চাই? মেয়েদের সামনেই দরজা বন্ধ করে কালকের খিদে মেটাবে?'

শুভায়ন উঠে পড়ে। রুমাল খুলে বাজে কাগজের ঝুড়িতে ফুলগুলো ফেলে রুমালটি ময়লা পোশাকের ডাব্বায় রেখে দেয়। শোবার ঘর থেকে বেরিয়ে পড়ার ঘরের দিকে যেতে থাকে। নিজেকে অত্যন্ত খারাপ, বিশ্রী এবং কামুক মনে হয়। সে তো কাম চরিতার্থ করার অভিলাষে রুদ্রপলাশ আনেনি! কিন্তু মিতালী এতবার এত রকমভাবে তার কামস্পৃহাকে অপমান করেছে—মাঝে মাঝে মনে হয়, সত্যিই বুঝি সে বিকৃতকাম!

ছোট মেয়ে মিতুলের মুখ ধোয়া হয়ে গিয়েছিল। সে ভিজে মুখ নিয়েই ছুটে এল বাবার কাছে। শুভায়নের হাত জড়িয়ে বলল, 'বাবা, তোমার রুমালে কী ছিল?'

'রুদ্রপলাশ।'

'কই, দাও আমায়।'

'ফেলে দিয়েছি।'

মিতুল বাবার হাত ছেড়ে মুখোমুখি দাঁড়ায়। ভিজে মুখ, এলোমেলো চুল, বড় বড় দুটি চোখে ব্যথিত বিস্ময়। বলে, 'ফুল ফেলে দিলে?' শুভায়নের বুকের ভিতর কষ্ট ও অপরাধবোধ গুমরে ওঠে। সে কোনওক্রমে বলে, 'কোথায় রাখব...বাজে কাগজের ঝুড়িতে!'

'আমি তুলে নিই?'

'নে।'

মিতুল মায়ের শোবার ঘরে ছুট লাগায়। বড় মেয়ে তুতুল আসে এবার। ভিজে হাত দুটি শুভায়নের দু'গালে বুলিয়ে বলে, 'বাবা, ইউ আর ক্যাচ কট কট।' শুভায়ন বড় মেয়ের বাসি বিনুনি টেনে বলে, 'কী ধরা পড়লাম!' 'ইউ ব্রট দোজ ফ্লাওয়ারস ফর মম বাট শি রিফিউজড।'

৪

কিছুকাল আগেও মেয়েদের ঊনচল্লিশ এবং পুরুষের ঊনপঞ্চাশ ছিল মধ্যবয়স। একালে এই বয়ঃক্রম অতিযুব বলা চলে। ষাট পার করে তবে আসে মধ্যবয়স। এই অতি যুব বয়সে সম্পর্ক সবচেয়ে বেশি ব্যঞ্জনাময়। এ সময় জীবন এক আশ্চর্য সাঁকো দিয়ে হেঁটে যায়। তার এক কাঁধে পিতামাতা খুড়া-মাতুল প্রমুখ পূর্ব প্রজন্মের ভার, অপর কাঁধে সন্তান-সন্ততি যথা নবতম প্রজন্ম। এ সময় জীবনের প্রতি অজস্র অভিযোগ জমা হতে হতে ঘোর বিষণ্ণতা। এ সময় অপরিমিত মায়াভার— যার সবটাই কাঙ্ক্ষিত নয়। কিন্তু

এ আছে বলেই জীবিত ও মৃতের তফাত ভুলে থাকা যায়। এই মায়া চেপে বসে এমন যে তাকে বয়ে চলাই একমাত্র লক্ষ্য হয় জীবনযাপনের।

যে-পুরুষ হয়তো বা বাইশ বছর ধরে জানে এক নারী তার পাশে শোয়, তার গায়ের ঘ্রাণের সঙ্গে ঘুম যায়, তার মৃদু কিংবা তীক্ষ্ণ কিংবা ঘ্যানঘেনে নাকের শব্দ আদি প্রত্যুষে তার ঘুম ভাঙিয়ে দেয়—তবু সে হয়তো জানে না সে-নারীর দক্ষিণ জানুতে বিলীয়মান কাটা দাগের ইতিহাস। জানে না চালতার গন্ধের সঙ্গে জড়িয়ে থাকা কৈশোরের রক্তিম স্মৃতি, জানে না, জানা হয়নি, কখন কোথায় কীরকম চুমু পেলে এই নারী প্রকৃতই শিহরিত হয়।

শিহরণ মুছে যায়। পুলক থাকে না। থাকে না পড়ার ইচ্ছা নয়নের ভাষা। কেবল একত্র বসবাসের অচ্ছিন্ন অভ্যাস।

যে-নারী বাইশ বছর ধরে চেনে এক নর। যে নরবর সহকারে সে জেনেছিল যৌথক্রীড়া ও কর্ষণের পর আবাদি ভূমির মতো হতে পারা অসামান্য পুলকিত সুখ, জেনেছিল এই নরবর ইলিশ মাছটি ভাজা তেল দিয়ে লঙ্কা দিয়ে গরম গরম ভাত বড় ভালবাসে। আজ সে জানে না কোন তৃষ্ণা, কোন ক্ষোভ, কোন বিরক্তির ফলে এ নরবরের মুখের মধ্যে দিয়ে বয়ে যায় নর্দমার স্রোত। স্প্যানিশ এস্রাজ তবলা বা তানপুরা তার ভয়ে থিরথির কাঁপে সারাক্ষণ। পথের তামাশার মতো পড়ে থাকে আদরের বস্তুগুলি।

এ সময় যদি কেউ ব্যগ্রভাবে বলে, 'কেমন আছেন? আপনার এস্রাজ? ভাঙেনি তো?' যদি আকুল প্রশ্ন করে কেউ, 'সেই কবিতাটি আপনার, সম্পূর্ণ করলেন? জানেন কলকাতার পথে পথে জ্যাকারান্ডা ফুটে গেছে? চেনেন না? ওই হালকা বেগনিরঙা ছোট ছোট ফুল, ঝাঁ-ঝাঁ রোদ্দুরে মনে হয় একখণ্ড প্রশান্ত মেঘ, ছায়া দেবে!'

বসন্ত, এ বসন্ত অতি দুষ্টমতি। কখন কোন দুটি মন ধরে মাখিয়ে দেবে ফুলের পরাগরেণু, তা কে জানে! অতএব দুটি ব্যস্ত জন, ফোনে ফোনে কথা বলল কিছুদিন। তারপর দেখা হল সঙ্গোপনে। কথা হল বিস্তর। আপনি থেকে তুমি হওয়া গেল। শুভায়ন বলল, 'জানো, মিতালীর প্রথম জন্মদিন এল যখন বিয়ের পর, ওর জন্য কবিতা লিখলাম। ভোর থেকে জেগে ওর কাছটিতে বসে রইলাম, ও যখন চোখ মেলবে—আমি শোনাব আমার কবিতা! যথাসময়ে ও উঠল। আমি পড়তে শুরু করলাম। ও বড় বড় হাই তুলল। তুড়ি মারল মুখের কাছে। অবশেষে বলল, শেষ হয়েছে? বড্ড পটি পেয়েছে। টয়লেটে যাব।'

'ইস্‌স্!'

'একদিন কথায় কথায় বলল, ওর জামাইবাবু ওর দিদির জন্মদিনে কত কী করে। নামকরা দোকান থেকে বিশাল ফুলের তোড়া পাঠায়। দামি উপহার দেয়। পাঁচতারা হোটেলে খাওয়াতে নিয়ে যায়। যামিনী, এগুলো কত সহজ কাজ বলো! নামী দোকানের ফুলের তোড়া আমরা আমাদের দামি কাস্টমারকে পাঠাই। তাই দিয়েই আমার বউয়ের জন্মদিন...এখন অবশ্য তাই করি।'

যামিনী বলল, 'কল্লোল প্রথমবার আমার জন্মদিনে চায়না টাউনে খাইয়েছিল। পরের দিকে নয়ন এসে যাবার পর আমরা নয়নের জন্মদিনই পালন করতাম। আমার শাশুড়ি যতদিন বেঁচে ছিলেন, ঘটা করে কল্লোলের জন্মদিনে ওর প্রিয় পদ রাঁধতেন। আমি এখন শুধু পায়েসটা করি। আমার জন্মদিন বোধহয় কল্লোলের মনেও নেই। মিতালী তোমার জন্মদিন করে?'

'করে। আমি যা যা ভালবাসি, রাঁধে।'

'কল্লোল আমার জন্মদিন মনে রাখেনি বলে আমার কোনও দুঃখ নেই। কিন্তু জানো, ও যখন বুঝে গেল নয়ন গানের দিকে ঝুঁকে পড়ছে, নয়নের জন্য কোনও উপহার আনা বন্ধ করে দিল। জন্মদিনে ছেলেটার জন্য একটা কেক পর্যন্ত আনে না।'

মিতালীর জন্মদিনে শুভায়ন শাড়ি কিনল যামিনীর পছন্দমতো। নয়নের জন্মদিনে শুভায়ন যামিনীকে কিনে দিল নয়নের জন্য চমৎকার কেক এবং ভিক্টোরিয়া বেকহ্যাম, নিকেল ব্যাক, মাইকেল জ্যাকসন, পিঙ্ক ফ্লয়েডের কত ডিভিডি। যামিনী বলল, 'জানো, সেদিন আমি আর নয়ন বসেছি এস্রাজ আর স্প্যানিশ নিয়ে। ফিউশনের আইডিয়া এসেছে ওর, তারই প্রচেষ্টা। খুব মন দিয়ে কাজ করছি দু'জনে। কল্লোল ঢুকল টলতে টলতে। চিৎকার করতে লাগল, 'এ সব হচ্ছেটা কী! বন্ধ করো, বন্ধ করো।' নয়ন বলল, 'তোমার কী অসুবিধে হচ্ছে?' 'কী। আবার মুখে মুখে কথা!' এক চড় মারল নয়নকে। প্রায়ই মারে জানো। নয়ন কিচ্ছু বলে না। খুব রাগ হল আমার। বললাম, 'তুমি যাও এ ঘর থেকে। আমাদের কাজ

সে তো কাম চরিতার্থ করার অভিলাষে রুদ্রপলাশ আনেনি! কিন্তু মিতালী এতবার তার কামস্পৃহাকে অপমান করেছে—মাঝে মাঝে মনে হয়, সত্যিই বুঝি সে বিকৃতকাম!

sunsilk সানসিল্ক PERFECT STYLE

চুল দিয়ে যাবে চেনা!

ড্যামেজ রিপেয়ার – টম ট, লন্ডন হেয়ার স্টাইলিস্ট, যাঁর ক্লায়েন্টদের মধ্যে রয়েছেন বিশ্ববিখ্যাত মিউজিশিয়ান, মডেল এবং অভিনেতারা। ড্যামেজড্ হেয়ারকে আগের চেহারা ফিরিয়ে দেওয়াই ওঁর প্যাশন। তিনি নিউ সানসিল্ক ড্যামেজ রিপেয়ার সলিউশন উইথ ন্যানো কমপ্লেক্সের সহ সৃষ্টিকর্তা যা চুলের প্রতিটি ইঞ্চিকে করে তোলে নিখুঁত এবং হেয়ার টেক্সচারে অভাবনীয় উন্নতি ঘটায়।

ড্যামেজ ফ্রি হেয়ারের জন্যে টম ট'র টিপস্

১। প্রথমে, চেক করে নিন আপনার চুল সত্যিই ড্যামেজড্ কি না। চুল ট্যাঙ্ক ভরতি জলে ডুবিয়ে রাখুন। যদি তা ভেসে থাকে, তা হলে বুঝবেন আপনার চুল সুস্থ। যদি চুলের গুচ্ছ ডুবে যায় তা হলে এর চিকিৎসা দরকার। বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নিন।

২। চুল শুকোনোর সময় তোয়ালে দিয়ে বাড়তি জল শুষে নিন। রগড়ে চুল মুছবেন না। আঁচড়াবার সময় সাবধান থাকুন, চুল ভিজে থাকার সময় খুবই দুর্বল থাকে।

৩। দিনে অন্তত ২ লিটার জল খান। আপনার শরীর এবং চুল দুইই আর্দ্র হয়ে উঠবে।

৪। যদি বিকল্প চিকিৎসার খোঁজে থাকেন, তা হলে অল্প পরিমাণে অলিভ অয়েল চুলে লাগিয়ে রাখুন। তেল ভাল করে ১ ঘণ্টা পর বসে গেলে, যেমন ভাবে চুল ধুয়ে শুকিয়ে ফেলেন, ঠিক তেমনই করুন।

বিবি যখন পরেসান ....
বাবু পেলেন সমাধান

Rs. 15/- per Pouch

কামাক্ষী
পুরুষদের জন্য
ক্ষমতা বাড়ায় সমস্যা মেটায়

Rs. 15/- per Pouch

কামা-৩০
মহিলাদের জন্য
ইচ্ছা জাগায় ক্ষমতা বাড়ায়

পার্শ্বপ্রতিক্রিয়াহীন আয়ুর্বেদিক ঔষধি

Mfd. By: Cresswell Chem Pvt. Ltd., Jodhpur (A GMP Certified Company)
AVAILABLE IN ALL LEADING MEDICAL STORES
visit us at : www.cresswell-herbal.com
N.B. : These information are for Registered Medical Practitioners only

করতে দাও।' কী বলে জানো? 'মাগি। তোর জন্য ছেলেটা নেশাখোর বদমাইশ হয়ে যাচ্ছে। না হলে ঝ্যাং ঝ্যাং করে গিটার বাজিয়ে গান গায়? শালা, সবার ছেলে ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার হবে বিদেশ যাবে ভেবে জান লড়িয়ে দিচ্ছে আর তোর ছেলে? যেমন তুই বাঈজিদের মতো বাজনা বাজাস— তেমনই তোর ছেলে।' ভেবে দেখো, নেশার জগৎ নিয়ে আমার কাজ। নয়ন নেশা করলে আমি বুঝব না? শুধু শুধু ছেলেটাকে দোষ দেওয়া। সে কথা বলতেই আমাকে কী বলল জানো? 'গতর ঢলানি মাগি! কার ছেলে তুই পেটে ধরেছিস? ও আমার ছেলে না। আমি ডিএনএ পরীক্ষা করব। প্রমাণ করে ছাড়ব তুই একটা বদ মেয়েছেলে!' জানো, যে ছেলে কখনও বাবার বিরুদ্ধে একটা কথা বলেনি, নীরবে মার হজম করেছে, সে হঠাৎ গর্জন করে উঠল— 'খবরদার! মাকে আর একটা কথাও বললে তোমার মাথা ভেঙে ফেলব আমি।' দেখি স্প্যানিশটাকে গদার মতো মাথার ওপর তুলে ধরেছে। আমি চিৎকার করলাম, 'নয়ন নয়ন, তোমার যন্ত্রটা ভেঙো না।' ও বসে পড়ল। কল্লোল মাথা নীচু করে চলে গেল ঘর ছেড়ে। দেখি নয়নটা কাঁদছে। বলে, 'মা, তুমি তো চাকরি করো। চলো আমরা কোথাও চলে যাই।' আমারও ইচ্ছে করে জানো। দিন দিন ওর অত্যাচার বাড়ছে। কিন্তু যখন ভাবি, আমরা চলে গেলে ও একা হয়ে যাবে, কে দেখবে ওকে? তখন মনে হয়, জীবন তো ফুরিয়ে এল। কী পাব এ সব করে? পুরনো কথা মনে হয়। ও রাগী, ও বদমেজাজি, মায়ের আস্কারা পাওয়া আত্মকেন্দ্রিক! কিন্তু বলো শুভায়ন, আমার বুকের মধ্যে প্রেমের প্রথম সঞ্চার তো কল্লোলকে নিয়েই হয়েছিল। কল্লোলের জন্যই...নয়ন তো আমাদের প্রেমজ সন্তান। আমরা পরস্পরের উপযুক্ত নই। আমাদের কোথাও কোনও মিল নেই। আমি সুরের মানুষ। ও অসুরের। আগে ওর আচরণ ছিল রুক্ষ এবং আত্মপর। এখন ও অত্যাচারী। তবু আমার মায়া হয়। আমি কী করব! যাকগে! আমার চেয়েও কত কষ্টে আছে কতজন! খেতেই তো পায় না কয়েক কোটি ভারতবাসী। তার চেয়ে বড় কষ্ট কিছু হয় না কি? নয়নকে এ সব বলি আমি। বোঝাই। কল্লোল ছাড়াও কত কী আছে তো আমার! আমার নয়ন, আমার এস্রাজ, আমার তুমি, আমার কাজ—ও একলা, আমার কিছুই কাড়তে পারবে না। নয়ন চেষ্টা করছে জার্মানি যাবার। ওখানে মিউজিক নিয়ে পড়বে। আমি জানি, ও যাবেই। আমাকে বলে, 'তোমাকেও নিয়ে যাব মা। ওখানে তুমিও বাজনা শিখবে।'

'আমাকে ছেড়ে চলে যাবে তুমি? যামিনী, যেও না। তোমার মতো বন্ধু যে আর নেই আমার।' শুভায়ন কাতরভাবে বলে। যামিনী শুভায়নের করতল নিজের গালে ঠেকিয়ে বলে, 'পাগল! এখনই কি আর আমি যাচ্ছি?'

'কোনও দিন যেও না। তুমি আমার সব। ভালবাসার স্বাদ এমন করে আমি পাইনি জানো। বলো আমাকে ছেড়ে যাবে না?'

'আচ্ছা।'

'কথা দিচ্ছ?

'কথা দেওয়া বলে কিছু হয় না শুভায়ন। শুধু তুমি আমাকে বলো, ভেবে বলো, আমাকে ভালবেসেছ বলে তোমার কোনও অপরাধবোধ নেই তো? দ্বিধা নেই তো? আমার নেই, তা বলে রাখি। তোমার কাছে এলে আমার মনে প্রশান্তি আসে। তাই আমার আর কোনও দ্বিধা নেই। তুমি আমার খোলা বাগানের মতো শুভায়ন।'

'না। আমার কোনও অপরাধবোধ নেই। তোমার প্রতি আমার টান আপনি জন্মেছে। কোনও লোভ থেকে নয়। তাড়না থেকে নয়। আমি তোমাকে বুঝতে পারি যামিনী। তোমাকে সব কথা বলতে পারি। বলে আনন্দ পাই। আমার ছোট-বড় যত কথা, আমার কাজের, সংসারের, কবিতার—সব কথা তোমাকে বলতে ইচ্ছে করে। এমন তো আগে কখনও হয়নি।'

একদিন শুভায়ন বলল, 'যামিনী, তোমাকে ভেবে আমার সঙ্গমের ইচ্ছা হয়।' যামিনী বলল, 'সে তো খুবই স্বাভাবিক শুভায়ন। কিন্তু আমি জানি না আমি কী করব! তোমার ভাল লাগবে কিনা। আমি ক্লান্ত। কল্লোলের কাম বড় নির্দয় জানো। আমি চাই, কী চাই না, আমার তৃপ্তি হল, কী হল না—ও পরোয়া করে না।'

'আমি তোমাকে খুব আদর করব যামিনী। অসুবিধে তো আমারও। যে ওষুধগুলো খেতে শুরু করেছি ব্যথার জন্য, তাতে কামবোধ কমিয়ে দেয়। অনুভূতিটাই ভোঁতা করে দেয় কেমন! শ্রীরূপকে বললাম। ও বলে, 'অনেক তো হল। এখন আর কামুক হয়ে করবিটা কী!' ওকে তো বলতে পারি না আমি যামিনীকে পেয়েছি, যাকে দেখলে আমার সঙ্গমের ইচ্ছা হয়।'

দু'জনে গাড়ি নিয়ে যেতে লাগল কৃষ্ণনগর, দুর্গাপুর, আসানসোল, শিলিগুড়ি। একজনের

কাজ পড়লে অপরজন কাজ বানিয়ে নেয়। সারাদিনের কাজের শেষে দু'জনে মুখোমুখি বসে চা পান করে। অতঃপর এক-একটি রাত্রির নিবিড় অনুভূতিময় একান্ত ভুবন। কখনও কথার পর কথা। কখনও নীরবতা। কখনও উত্তাল সঙ্গম, কখনও শিথিল আলিঙ্গনে ভরা মধুর নৈঃশব্দ। এই রাতগুলি থেকে শুভায়ন পেল গভীর চুম্বনের স্বাদ। যামিনী পেল নরম, সশ্রদ্ধ, সম্মত সঙ্গমের গভীর আরাম। দুটি মন যত দুঃখ-ব্যথা ভাগ করে নিয়েছিল। এবার রচিত হল অনন্য শরীরী প্রেম। দু'জনে ভেসে গেল।

৫

এক বছর পর আবার এল বসন্তমাধবীকাল। সম্পর্কের বর্ষপূর্তির কালে শুভায়ন বলল, 'চলো ভুবনেশ্বর যাই।'

'চলো।' যামিনী বলল।

'ওই হোটেলেই উঠব আমরা। ওই ঘরটাই নেব।'

'ওঃ! দারুণ হবে। ক'দিন থাকব?'

'অন্তত দু'রাত। ধরো এক সন্ধ্যায় গেলাম। পরের পুরো দিন থেকে, তার পরদিন সকালে ফিরলাম।'

'বেশ। এখন ভাল ভাল ট্রেন আছে ভুবনেশ্বর পর্যন্ত।'

'পাগলি একটা। আমরা বিমানে যাব আসব। ও সব আমি ঠিক করব। তুমি শুধু আমার সঙ্গে যাবে।'

'অনেক খরচ হয়ে যাবে যে তোমার। এমনিতেও তো এদিক-ওদিক যাবার সময় তুমি কত খরচ করো।'

'খরচের কথা ভেবো না। সম্পর্কের বর্ষপূর্তিতে এ আমার উপহার।'

'আমিও তবে সঙ্গে নেব আমার এস্রাজ। বাজিয়ে শোনাব তোমাকে। আজও যে তোমাকে শোনানো হল না আমার বাজনা। এই হোক আমার উপহার তোমার জন্য।'

'কী বলে এস্রাজ সঙ্গে নেবে তুমি? কল্লোল সন্দেহ করবেন না?'

'ভেবো না গো। সামলে নেব আমি। বলব সারাতে দিয়ে যাব। বলো, কখন তুমি শুনবে, আমার বাজনা?'

'খুব ভোরের বেলা আমরা জেগে উঠব। তুমি বাজাবে ললিত, আর আমি তোমার সুরে সুরে কথা গেঁথে সৃষ্টি করব কবিতা।'

'উফ্‌ফ্‌। ভাবতেই বুকের ভিতরে কী রকম করছে গো।'

'আমারও।'

যাত্রার দিন সন্ধ্যায় দু'জনে উপস্থিত হল কলকাতা বিমানবন্দরে। আনন্দে ভরপুর দু'জন। যেন সদ্য উড়তে শেখা চিলের ছানা। শুভায়ন নিজের পকেট থেকে ই-টিকেট বার করে এক কপি যামিনীকে দিল। যামিনী টিকিট দেখে চমকে উঠল। শুভায়ন সরকার ও মিতালী রায় সরকারের নামে টিকেট। তার

মনখারাপ হয়ে গেল। শুভায়ন বলতে পারত টিকিট সে মিতালীর নামে কাটবে। যামিনী তখনই কিছু বলল না। আজ বিমানবন্দরে বড্ড বেশি পাহারাদারি। খবর আছে, কলকাতা বিমানবন্দর উড়িয়ে দেবে আজ সন্ত্রাসবাদীর দল। এরকম খবর প্রায়ই আসে। কখনও হাওড়া স্টেশন, কখনও শিয়ালদহ, কখনও কোনও প্রেক্ষাগৃহ। শেষ পর্যন্ত কিছু হয়নি। কিন্তু সাবধান তো হতেই হয়। পর পর কত বিস্ফোরণ হল হায়দরাবাদে, বেনারসে, জয়পুরে। মুম্বইয়ের ওপর আক্রমণ সবচেয়ে বেশি।

তারা বোর্ডিং পাস নিল। লাগেজ বুক করল। নিরাপত্তার পরীক্ষা দিতে মেয়ে এবং পুরুষের পৃথক সারিতে দাঁড়াল। যামিনীর আগে শুভায়ন নিরাপত্তার বেড়া পেরিয়েছে। সে বেড়ার ওপারে যামিনীর কাছাকাছি এসে দাঁড়াল। এত দেরি হচ্ছে কেন যামিনীর? শুভায়ন দেখল নিরাপত্তা রক্ষিণী যামিনীর হাতব্যাগে দুটি পেনসিল ব্যাটারি পেয়েছে। ব্যাটারি? হাতব্যাগে ব্যাটারি।। যামিনী কি জানে না এ সব নিতে নেই?

একই প্রশ্ন নিরাপত্তা রক্ষিণীও করল যামিনীকে। যামিনী বলল, 'জানি। আসলে সেই কবে ব্যাগে ব্যাটারি রেখেছিলাম, মনে ছিল না।'

'কিসের ব্যাটারি এটা?'

'ক্যামেরার।'

'কোথায় তোমার ক্যামেরা? সঙ্গে আছে?'

'না। আমি দুঃখিত। সঙ্গে নেই।'

'তোমার সঙ্গে কেউ আছেন?'

'হ্যাঁ।' একবার ঢোক গিলে যামিনী বলল, 'আমার স্বামী।'

'তিনি কোথায়?'

'ওই তো।' সে শুভায়নকে দেখাল। রক্ষিণী বলল, 'তোমার ব্যাটারি আমি রেখে নিলাম। তুমি এই খাতায় তোমার নাম-ঠিকানা তোমার স্বামীর নাম-ঠিকানা ফোন নম্বর সব লেখো। প্রয়োজনে যাতে আমরা তোমাকে খুঁজে পাই। তোমাদের কারও কোনও পরিচিতিপত্র আছে? দেখাও।'

যামিনী অসহায় চোখে তাকাল শুভায়নের দিকে। টিকিট মিতালীর নামে। বিমানবন্দরে প্রবেশের সময়তেই সে শুভায়নের স্ত্রী হিসেবে ছাড় পেয়েছে। নিজের পরিচিতিপত্র দেখাতে পারেনি। এদিকে মিতালীর ঠিকানা, ফোন নম্বর, কিছুই তার জানা নেই! নিজের ঠিকানা লেখার বিপদ আরও বেশি। যদি কোনওভাবে অনুসন্ধান হয়, নাম-ঠিকানা না মেলে, সবাই বিপদে পড়ে যাবে। শুভায়নের মুখ পাংশু হয়ে গেছে। সে ঠিকানা বলতে লাগল। নম্বর বলতে লাগল। যামিনী লিখল। নিরাপত্তার বেড়া ডিঙিয়ে ভিতরে যাবার অনুমতি পেল সে।

শুভায়নের ভ্রূ কুঁচকে রয়েছে। মুখে ক্রোধী ব্যঞ্জনা। এই শুভায়ন সরকার কবি নয়,

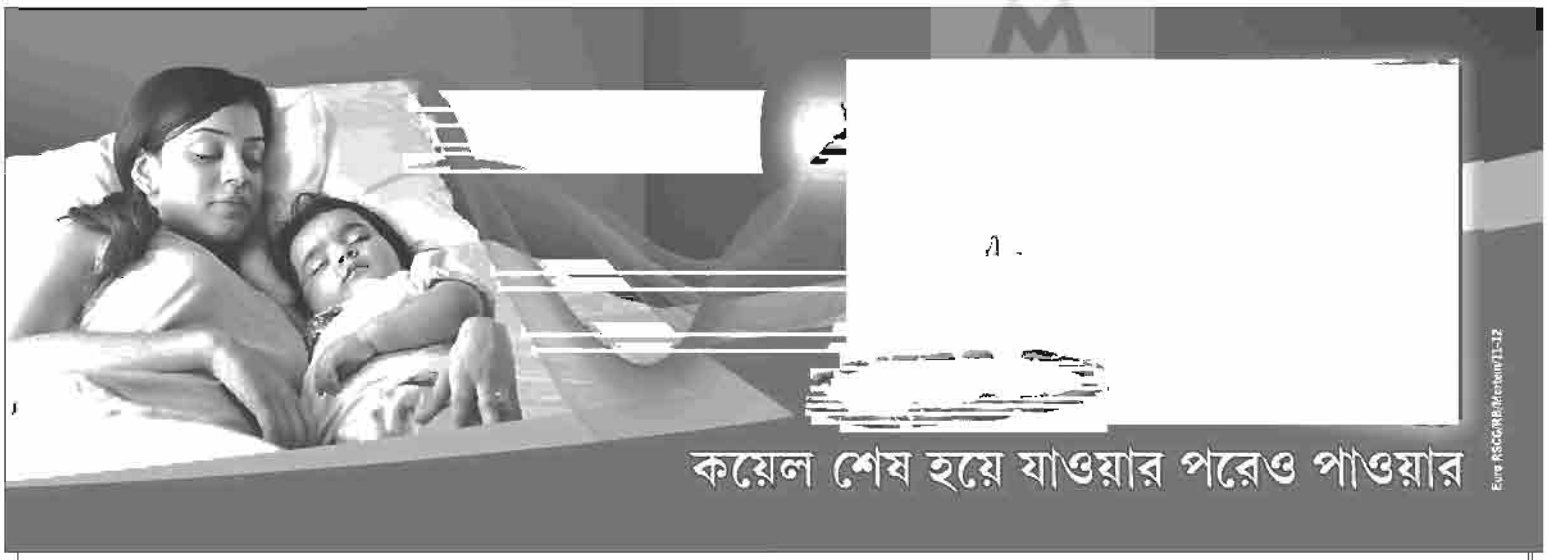

‘অপরাধী? কিসের অপরাধ? মানুষের ভুল হতে পারে না? আমি তো মিতালীকে ফাঁসাবার জন্য ইচ্ছে করে ব্যাটারিটা আনিনি শুভায়ন।’
‘আমি তা বলিনি। এটা দায়িত্বজ্ঞানহীনতা।’

প্রেমিক নয়—বহুজাতিক সংস্থার একজন সফল বিপণন পরিচালক। অধস্তনের কোনও ব্যর্থতা বা মূর্খামিতে যে এভাবেই ক্রুদ্ধ হয়! যামিনী তার মুখ দেখে বলল, ‘খুব দুঃখিত আমি। অনেকদিন পর এই ব্যাগটা নিয়েছি তো, ব্যাটারির কথা মনে ছিল না।’
‘কী হবে যদি ওরা মিতালী সম্পর্কে খোঁজখবর নেয়! অকারণে মিতালীকে অপরাধী করা হল।’
‘অপরাধী? কিসের অপরাধ? মানুষের ভুল হতে পারে না? আমি তো মিতালীকে ফাঁসাবার জন্য ইচ্ছে করে ব্যাটারিটা আনিনি শুভায়ন।’
‘আমি তা বলিনি। এটা দায়িত্বজ্ঞানহীনতা। ধরো যদি সত্যি বিস্ফোরণ হয়? তখন?’
‘দুটো পুরনো, ক্ষয় হয়ে যাওয়া ব্যাটারি, তুমি বলতে চাও বিস্ফোরণের জন্য শেষ পর্যন্ত ওই ব্যাটারির মালিককেই ওরা দায়ী করবে?’
‘কী থেকে কী হয়, কে বলতে পারে।’
আর কোনও কথা হল না দু’জনের। পুরো আকাশপথ পরস্পর মুখ ফিরিয়ে রইল। শুভায়ন ভয়ে কাঁটা হয়ে রইল, যদি মিতালী জানতে পারে, তা হলে কী হবে। আর যামিনী মরমে মরতে লাগল, কেন সে শুভায়নের ব্যবস্থাপনায় এল। কেন মিতালী রায় সরকারের নামে বিমানে চাপতে সম্মত হল! কেন গোড়াতেই প্রতিবাদ করল না। হোটেল ‘গোল্ডেন আই’-এর সেই ঘর। সেই বারান্দা। সেই তুলতুলে সাদা বিছানা বালিশ। সুন্দর বিশাল স্নানঘর। সেই খোলা প্রশস্ত বারান্দা। সেই দুটি জন। নীরব, আতপ্ত, ক্রোধী!
যামিনী স্নান সেরে এল। শুভায়নও পরিচ্ছন্ন হয়ে বেরিয়ে দেখল যামিনী হালকা শব্দে টেলিভিশনে সংবাদ দেখছে। শুভায়ন যামিনীর পাশে বসে কাছে টানল তাকে। বলল, ‘এখনও রাগ করে থাকবে? আরে কিচ্ছু হবে না। তখন একটু ভয় করছিল।’
যামিনী শক্ত। কাছে যেতে নারাজ। বলল, ‘যদি বিস্ফোরণ হয়!’
‘হবে না।’
‘আমাকে খবর শুনতে দাও।’
‘পরে শুনো। এখন কাছে এসো।’
‘না।’
‘আর রাগ কোরো না। আমার ওভাবে তোমাকে বলা উচিত হয়নি। আমাকে ক্ষমা করো যামিনী।’
‘তোমার আমার সঙ্গে আসাও উচিত হয়নি। মিতালীর নামে তুমি টিকিট কেন কাটলে? অফিস থেকে স্ত্রীর খরচ পাবে বলে? আমাকে এত অপমান কেন করলে তুমি?’
‘অত জটিল করে ভেবো না। কম্পানির এজেন্টকে দিয়ে কাটিয়েছি বলে...’
‘বাইরে শত শত এজেন্ট আছে শুভায়ন। তাই বলে আমাকে তুমি মিতালীর নামে নিয়ে আসবে? আমরা যখন পরস্পরকে চিনতাম না পর্যন্ত, তখনই একসঙ্গে ছিলাম। আজ কি আমাকে তোমার বউ সাজিয়ে আমাদের সেদিনের থাকা এবং আমাদের সমস্ত সম্পর্ককে তুমি অপমান করলে না? তুমি বলেছিলে তোমার এই সম্পর্ক নিয়ে অপরাধবোধ নেই, কিন্তু তুমি মিথ্যে বলেছিলে। তুমিও কল্লোলের মতোই একজন সংস্কারগ্রস্ত মানুষ। আধুনিকতার ভান করতে শিখেছ শুধু। ভাল থাকবে, অক্ষত থাকবে তোমার বউ! ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি, যেন বিস্ফোরণ না হয়। শুভায়ন, কাল আমি দুপুরের ট্রেনে চলে যাব।’
‘না।’
‘তোমার কাছে আর আমি আসব না।’
‘না। যামিনী না। আমি তোমাকে ভালবাসি। এত ভাল আর কখনও কারওকে বাসিনি। আমাকেও কেউ তোমার মতো করে এত ভালবাসা দেয়নি। যামিনী, ছেড়ে যাবার কথা আমাকে বোলো না।’
‘তুমি মিতালীকে ভালবাসো। শুধু মিতালীকেই।’
‘না-না। এই যে তুমি বলো, কল্লোলকে ছেড়ে আসতে পারবে না, তাতে কি আমার প্রতি তোমার ভালবাসা মিথ্যে হয়ে যায়? কী এসে যায় যদি তুমি মিতালীর পরিচয়েই আসো? আমার কোনও আপত্তি হবে না যামিনী, যদি কোনও পরিস্থিতিতে আমাকে কল্লোল সাজতে হয়! মিথ্যাচার করতে হবে, এটা না মেনে আমাদের উপায় কী বলো। আমরা দু’জন ছাড়া সত্যিটাকে কেউ মূল্য দেবে? কেউ বুঝবে, কেন এই বুড়ো বয়সে আমরা এমন কাছে এলাম? পরিবারকে সুখী রাখার জন্য, অফিসের কাজের স্বার্থে কত মিথ্যে মেনেছি যামিনী! এটুকু তো আমাদের জন্য!’
‘আজ আমি সারারাত সংবাদ পাহারা দেব। আমি বিস্ফোরণ হতে দেব না। তুমি নিশ্চিন্ত হও।’
‘ক্ষমা করো। আমাকে ক্ষমা করো।’
যামিনী পাথর হয়ে রইল। শুভায়ন ক্ষমা চাইল। কাঁদল। কাতর আবেদন করল একবার যামিনীকে জড়িয়ে ধরবে বলে। যামিনী নড়ল না। খেল না। শুভায়নও খেল না। এই প্রথম যামিনীর কঠিন দুর্ভেদ্য আচরণে শুভায়নের মনে হল যামিনী অনেক দূরের। যামিনী বারংবার টিভি খুলল, সংবাদ দেখল, টিভি বন্ধ করল। নিদ্রাহীন রাত্রি কঁকিয়ে ফিরতে লাগল। হাঁসগুলি দুঃস্বপ্ন দেখে অস্ফুট আর্তনাদ করতে লাগল। বসন্তসমীর ব্যর্থ হয়ে মিশে গেল জলে। ললিত বাজল না। কবিতা রচনা হল না। এপ্রাজ শবের মতো শুয়ে রইল তুলতুলে গদি-আঁটা কেদারায়। ভোর হল যখন, ব্যথা আছড়ে পড়ছে শুভায়নের মাথায় গালে কপালে ঠোঁটে। মাইগ্রেনে ছিঁড়ে পড়ছে যামিনীর মাথা। সে বমি করল দু’বার। শুশ্রূষার জন্য শুভায়নকে কাছে ঘেঁষতে দিল না। সকাল ন’টার সময় শেষবার খবর দেখল সে। না, বিস্ফোরণ হয়নি কলকাতায়। ভারতের কোথাও হয়নি। এশিয়ার কোথাও নয়। এই মহা পৃথিবীর কোথাও—কোথাও বিস্ফোরণ হয়নি কাল। যামিনী ব্যাগ গোছাতে লাগল। পরে নিল বাইরে যাবার পোশাক। বেরোবার আগে যামিনী শেষবার ঢুকল স্নানঘর সংলগ্ন ঘরটায়—যেখানে ব্যাগ, পোশাক, জুতো রাখার জায়গা। যেখানে ফ্রিজ, বেসিন এবং কমোড। যেখানে দেওয়াল জোড়া আয়না। কিছু কি ফেলে গেল? কী ফেলে গেল? সে স্নানঘরের দিকে দেখল। মাথা ছিঁড়ে যাচ্ছে যন্ত্রণায়। সে দেখল ঘষা কাচে পড়ছে ধারা জল। কাচ স্বচ্ছ হয়ে যাচ্ছে। দেখা যাচ্ছে শুভায়নের গৌর সুঠাম নির্মেদ শরীর। নগ্ন ও সিক্ত। ব্যথার সঙ্গে ব্যথার দেখা। সমুদ্দুরে। নোনাজলের ঢেউ এসে ওই ভাসিয়ে দিল অনেক দূরে। কোথায় সে দূর? নেই সীমানা। ব্যথার কথা অন্য ব্যথার হয়নি জানা। সহসা যামিনী ভুলে গেল সব—কিংবা তার সব মনে পড়ে গেল। কী হল সে জানে না। মাথা ছিঁড়ে যাচ্ছে যন্ত্রণায়, অথচ তার স্তন শক্ত হয়ে উঠছে। তলপেটে সুমধুর যন্ত্রণা, যোনি কাঁপছে সুখী আহ্লাদী বেড়ালনির মতো। সে টোকা দিল স্নানঘরের দরজায়। দরজা খুলে দাঁড়াল নগ্ন ও সিক্ত সুদর্শন প্রেমিক শুভায়ন। যামিনী তার চোখে চোখ রেখে বলল, ‘আমি চলে যাচ্ছি।’
‘না!’ আর্তনাদের মতো বলল শুভায়ন। সবলে যামিনীকে টেনে নিল ধারাজলের তলে। যামিনী আত্মসমর্পণ করল। শুভায়ন তাকে কামড়াল, আঁচড়াল, কাঁদল, নগ্ন করল! তার মধ্যে আমূল প্রবেশ করে পাগলের মতো চুমু খেতে খেতে বলতে লাগল, ‘কোথায় যাবে তুমি? কোথায় যাবে?’ যামিনী বলল, ‘তোমার ব্যথা করছে না তো!’
‘করুক! ব্যথায় গাঁথা আমাদের সম্পর্ক! আঃ!’
পরস্পরকে সবলে আঁকড়ে ধরল তারা।

অলঙ্করণ: পিয়ালি বালা